নবনীতা দেবসেন
বুদ্ধি বেচার সওদাগর
এখানে সুবুদ্ধি বিক্রয় করা হয়
বুদ্ধি বেচার সওদাগর
নবনীতা দেবসেন
অঞ্জলি

সমকালের বাংলা সাহিত্যে নবনীতা দেব সেনের কিশোর রচনার একটা অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে। কারণ, কেবল ছোটদের মনের কথা বা শুধু তাদের জন্য লেখাই নয়, তাদেরই একজন শরিক হয়ে এ ধরনের গল্পে লেখিকার স্বতস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ চোখে পড়ে। 'বুদ্ধি বেচার সওদাগর' এরকমই এক রূপকথার মায়া জড়ানো কিছু গল্পের একত্র সংকলন। গল্পগুলি পড়লে শিশু ও কিশোর মন আপনা থেকেই চলে যেতে পারে এক স্বপ্নের জগতে। আর সেই স্বপ্নের জগতে তারা অনায়াসেই পেয়ে যায় তাদের ইচ্ছাপূরণের চাবিকাঠি। কিশোর-কিশোরীর মনের এই স্বপ্নিল মানচিত্র লেখিকার নখদর্পণে। তাদের কৌতুক, কৌতূহল, দুঃসাহস আর রোমাঞ্চ যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় প্রতিটি গল্পে।

'বুদ্ধি বেচার সওদাগর', 'রূপবতীর বিয়ে', 'রুবাইয়ের বারান্দা আর বনপাহাড়ি', 'টাপুর টুপুর ও বনদেবী', 'বিদঘুটে বাড়ির গল্প', 'টুলুরাজকুমারী আর টুবান' —ইত্যাদি গল্পগুলি যেন সেই কিশোর কিশোরীকেই একান্তভাবে উৎসর্গ করেছেন—যাদের রঙিন মনে গল্পগুলি হয়ে উঠতে পারে আরও রঙিন, আরও বর্ণময়, আরও উজ্জ্বল।

ISBN 81-87114-14-2

বুদ্ধি বেচার সওদাগর

নবনীতা দেব সেন

অঞ্জলি প্রকাশনী
কলিকাতা-৮৪

উৎসর্গ

আয়ুর্ব শরণ্য

নবীন

লীলা লক্ষ্মী

সাদরে

সূচীপত্র

বিদঘুটে বাড়ির গল্প

পিকো-টুম্পাদের বাড়িটাতে নিত্য-নতুন অঘটন-দুর্ঘটন ঘটছে, বুদ্ধিতে ছাড়া যার ব্যাখ্যা চলে না। লৌকিক না অলৌকিক তার মীমাংসা করতে এবার প্রবীরবাবুকে ডাকতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি তোমরা কী বলছ। তোমরা বলছ পিকো-টুম্পাদের বাড়িতে তার মা-জননীটিও তো থাকেন? অঘটন ঘটবে না তো কী? প্রবীরবাবুকে ধরতে হবে না, তোমাদের কাউকে ধরে আনলেই সব রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে। যে-কোনও বুদ্ধিশুদ্ধিসম্পন্ন, সুস্থ মস্তিষ্ক, পরিপার্শ্বসচেতন ব্যক্তিই এ-বাড়িতে সব ধাঁধার সমাধান করে দিতে পারবেন—ফেলুদাকে চাই না, তোপ্‌সেই যথেষ্ট। কেননা, তোমাদের মতে সব রহস্যের গোড়ায় আছে নির্ঘাত আমারই ভুলভ্রান্তি, অন্যমনস্কতা, অগোছালো স্বভাব। এই তো? আজ্ঞে না। তোমাদের ভুলটা এইখানেই। কেননা যে সব অঘটন আমার জন্য ঘটে (ঘটে তো বটেই) সেগুলো মোটেই রহস্যময় হয় না। এ-জীবনে আর যে 'রহস্যময়ী' হয়ে ওঠা হল না, মা হয়ে এটা কি আমার কম দুঃখ? না পারি একটাও জিনিস লুকোতে, না একটা খবর লুকোতে। মেয়েরা আগেই সমস্ত কিছু জেনে বসে থাকে। তারা ক্ষুদ্রসন্ধানী, শ্যেনদৃষ্টি, সবজান্তা। তাদের ফাঁকি দেওয়া কালোবাজারিদেরও অসাধ্য। রহস্যহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়!

না, আমাদের বাড়ির অঘটন-দুর্ঘটনের রকমসকমটা সত্যিই গভীর রহস্যময়, অপ্রাকৃতিক। অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ এসব ঘটনার কেন্দ্রস্থলে যারা আছে তারা মানুষ নয়।

মনে আছে, খবরের কাগজে মাঝে খুব ভূতের খবর বেরোচ্ছিল? একজনদের বাড়িতে ভূত কাঠের জানলা, আলমারি সব ফাটিয়ে দিচ্ছিল। আরেকজনদের বাড়িতে ভূত কাঁচি দিয়ে কাপড়চোপড় কেটে কুচিকুচি করছিল। শ্যাম্পু ছুঁড়ে মারছিল ইত্যাদি। পুলিশ ডেকে উপায় হল না। আমাদের পুলিশ গরু-চোরই ধরতে পারে না, ভূত ধরবে কেমন করে? তখন ডাক পড়ল ভূতের পুলিশ প্রবীরবাবুর। তিনি কয়েকদিন ধরে তল্লাশি, জেরা ইত্যাদি চালিয়ে দুই বাড়ি থেকে দুটো জলজ্যান্ত ভূত পাকড়াও করলেন। দুটোই তোমাদের বয়সী, একজন আবার ভূতনি। কেন তারা এমন রহস্যময় ভূতুড়ে কেলেঙ্কারি করছিল? না, বড়দের নজর কাড়তে। ওরা নিজেদের অবহেলিত বোধ করত। এখন সারা দেশের নজর কেড়ে, যারপরনাই অভিভূত সন্দেহ নেই।

পিকো-টুম্পাদের উদ্ভট বাড়িতে এরকম ধরনের কিছু ঘটে না। একদিন বাড়িতে খটাখট খাট নড়ল বলে তো আমি ভুটানিকে ভীষণ বকলুম, "ফের তুই লাফ দিয়ে-দিয়ে খাটের নীচে আরশোলা ধরছিস?" ভুটানিও কান নামিয়ে লেজ গুটিয়ে অপরাধী মুখ করে রইল। পরদিন কাগজে দেখি, ভূমিকম্প হয়েছিল। বেচারি ভুটানি! এরকম নয়। অন্যরকম।

এ-বাড়িতে যা ঘটে তার নায়ক-নায়িকারা মানুষ নয়। কিন্তু অশরীরীও নয়। কেউ মাছ, কেউ বেড়াল, কেউ পাখি, কেউ কুকুর, কেউ চামচিকে। আমাদের বাড়িতে এদের প্রত্যেকের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং সেই ভূমিকায় তারা মাঝে মাঝেই অবিশ্বাস্যরকম অঘটন ঘটিয়ে ফেলে। প্রায়ই তার শেষ হয় দুঃখে। এরা ভূত নয় কেউই, সবাই জ্যান্ত, কিন্তু অদ্ভুত। কত বাড়িতে কত লোকই তো জীবজন্তু পোষে, তারা কতকিছু পারে। কেউ খবরের কাগজ এনে দেয় বারান্দা থেকে। কেউ বল কুড়িয়ে দেয় মাঠ থেকে। কেউ হ্যান্ডশেক করে। কেউ বুলি পড়ে, কথা কয়। কেউ ইঁদুর ধরে, বাড়ি ইঁদুরমুক্ত রাখে। কেউ বাড়ি পাহারা দেয়। আমাদের বাড়ি ওসব পাবে না। আমাদের বাড়িতে কুকুর-বেড়ালেরা সবাই অশিক্ষিত, মূর্খ। তারা লোক ভাল বলে মোটামুটি কথা শোনে, এই পর্যন্ত। তারা হিংস্র নয় বলে কাউকে কামড়ায় না। তবে তাদের প্রচণ্ড আইডেনটিটি ক্রাইসিস হয়। আমরা এই অদ্ভুত বাড়িতে তাদের সঙ্গে যে কেন বিজাতীয় আচরণ করি কে জানে? আমাদের কুকুর-বেড়ালেরা জানে না, তারা কুকুর, না বেড়াল। কখনও-কখনও ভাবে তারা মানুষ। কখনও ভাবে পাখি। এজন্যই যত কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি ঘটে। প্রকৃতিজননী তাদের যেমনটি শিখিয়ে জন্ম দিয়েছেন, তারা সেসব ভুলে মেরে দিয়ে এ-বাড়িতে এসে রীতিমত অ-প্রকৃতিস্থ আচরণ করে। যেমন এই

লাল মাছেদের আচরণটাই ধরো।

মাছ কখনও ডুবে মরে? কেউ শুনেছ? আমাদের বাড়িতে কিন্তু মরে। কাচের বাক্সতে রঙিন নুড়ি বিছিয়ে, লাল টুকটুকে জাপানি ব্রিজ সাজিয়ে, গুহাওয়ালা নকল পাহাড় বসিয়ে, মাছেদের জন্য ঝিলমিলে নিক্কো চিলড্রেন্স পার্ক তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল, তাতে একটা ঢালু ঢাকনিও ছিল, বেশ বাড়ির ছাদের মতন। একবার কী কারণে সেই ঢাকনিটা খুলে রাখতে হল। ইলেকট্রিক লাইটটা সারানোর জন্য বোধহয়—আর গুনিয়াভাই একটা অ্যাসবেস্টসের ভারী শিট চাপিয়ে রাখল, যাতে আমাদের বেড়াল না মাছগুলো ধরে ধরে স্ন্যাক্স সারে। কিন্তু এত যত্নেও সেই মাছেরা এক সময়ে খাবি খেতে-খেতে ডুবেই মরে গেল। কী? সমাধান করো ধাঁধাটার? বিকাশ সমাধান করেছিল। তিন সেকেন্ডে। সবারই যখন গালে হাত, "অ্যাঁ? মাছ কিনা ডুবে মরল? কি অলুক্ষণে কাণ্ড রে বাবা?" দুটো রামধনু রঙের স্বচ্ছশরীর রুইতন আকৃতির মাছ। আর দুটো সরু লম্বা ছুঁচলো মুখ, কালো-সাদা ডুরে শাড়ি-পরা মাছ। চারজনেরই জলমগ্ন হইয়া অপঘাতে মৃত্যু ঘটিল। কার কপালে কী আছে কে বলতে পারে?

মাছগুলোর লম্বা লম্বা বিলিতি নামগোত্র ছিল। ওসব আমি বুঝিও না, শিখিও না। আমি বুঝি রং আর শেপ। রসগোল্লার মতো ফুলকো গোল? না কি জিবে গজার মতো চ্যাপটা গোল? থ্যাবড়া নাকি, না ছুঁচলোমুখী? রুইতনের মতন, না ছোরাছুরির মতন? রোগা, না মোটা। লাল না নীল, কালো না সোনালী, বুটিদার না ডুরেকাটা। আভা বেরোয়, না বেরোয় না, ল্যাজ লম্বা না নাক লম্বা—এইসব ডিটেলে আমি উৎসাহী। কিন্তু মাছ ডুবে মরেছে, এ-গল্পটা মোটেই গাঁজাখুরি নয়। বিকাশ উত্তরটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। কাচের বাক্সটা পুরোপুরি জলে টইটুম্বুর ভর্তি করে, গুনিয়াভাই তাতে চ্যাপটা ঢাকনি এঁটে দিয়েছে। আর অক্সিজেনের অভাবে মাছগুলো খাবি খেয়ে ডুবে মরেছে। টিনের ছাদটা ছিল উঁচু, তাতে অনেক বাতাসের জায়গা থাকত। জলেও কখনও সবটা বাক্স ভরাট করা হয় না। হঠাৎ অতি যত্নেই এই ব্যাপার। বদ্ধ বাক্সতে একটুও বাতাস ছিল না—মাছেরা শ্বাস নিতে পারেনি। বেড়ালের থাবা থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাদের মৃত্যুর থাবায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

যত দোষ নন্দ ঘোষ। আমাকেই সবাই বকতে লাগল, "সত্যি নবনীতা! তোর বাড়িতেই কেবল এটা সম্ভব, মাছেরা জলে ডুবে মরে!" মেয়েরা তখন খুব ছোট, ওদের কেউ দোষ দিল না। যার বাড়ি অর্থাৎ মা, তাঁকেও না। যে করল অপকর্ম—গুনিয়াভাই, তাকেও না।

কিন্তু আমি কী করব, আমাদের বাড়িটাই যদি এমন কিম্ভূতকিমাকার হয়? এই তো গতকালের কথা। একটা কাক আমাদের এই কদমগাছটা থেকে মট করে ডাল ভেঙে শূন্যে পড়ে গেল। গাছের ডাল ভেঙে তুমি-আমি তো শূন্যে পড়ে যেতেই পারি, আমরা হচ্ছি গিয়ে মানুষ! কোন্‌কালে বানর ছিলুম। হুপহাপ করে গাছে-গাছে বেড়াতুম, সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।

ইয়ুংসাহেব যাই বলুন স্বপ্নেটপ্নে কী বাকি আছে জানি না, বাস্তব জীবনে কবেই চুকেবুকে গেছে সেসব প্র্যাকটিসের পালা! তা বলে পাখি পড়ে যাবে? পাখি? কিন্তু পাখিই পড়ে গেল। চোখের সামনে দেখলুম। সরু লিকলিকে একটা শুকনো কাঠিমতন ডালে বসে বসে দোল খাচ্ছিলেন তিনি অনেকক্ষণ ধরে। চলচ্চিত্রের নায়িকাদের মতো, ডেলিকেটলি—আনমনে। ওপরের ডালে সম্ভবত তারই জুড়ি বসেছিলেন। তিনি কাক না কাকিমা, আমি ঠিক চিনি না। ইনি তো আপনমনে দুলছেন, হঠাৎই মটাস করে ডালটা ভাঙল আর কাকবাবাজীবন শূন্যে চিতপাত হয়ে পড়ে গেলেন। পড়তে-পড়তেই ধড়মড় করে সচেতন হয়ে উঠে চকিতে ডানা মেলে উড়ে গিয়ে অন্য ডালে বসলেন তিনি। বাঁচা গেল, পতনটা সম্পূর্ণ হল না। তবু স্পষ্ট বোঝা গেল যে, কাকবাবুর বেশ ক'টা মুহূর্ত মোটে মনেই ছিল না যে, উনি পাখি। ওঁর দুটো আস্ত ডানা আছে। সহসা শূন্যে ডিগবাজি খাওয়ার কথা ওঁর নয়। মাটিতে পড়ে যাওয়ার কোনও চান্সই ওঁর নেই, কেননা যে-কোনও মুহূর্তে আকাশই ওঁকে লুফে নেবে, নেবেই—পাখা মেলে উড়ে যাওয়ার শক্তি আছে ওঁর। অথচ অপ্রস্তুত, পতনোন্মুখ সেই বেচারি কাকের সমগ্র চেহারার মধ্যেই ছিল নিরাপত্তার নিশ্চিত সঙ্কেত। তোমরা বিশ্বাস করলে না তো? ভাবছ পিকো-টুম্পার মা কী গুলই মারেন! হ্যাঁ, গুলও আমি মারি, মাঝে-মধ্যেই। কিন্তু এটা গুল নয়, একদম সত্যি। এ-গল্পটার সব কথাই সত্যি। আমার মা রহস্য উন্মোচন করে বললেন, "কাকটা বোধহয় পূর্ণবয়স্ক হয়নি। এখনও ওড়াউড়িটা ঠিক অভ্যেস হয়নি ওর।" সে বড় কাক না বাচ্চা কাক জানি না, তবে ঘাবড়ে যাওয়ার চিহ্ন ফুটেছিল তার শরীরের সব ভঙ্গিতে।

মানুষের জীবনেও প্রায়ই এটা ঘটে। হঠাৎ পড়ে যেতে-যেতে আমরা ভুলেই যাই ডানার কথা। ভয় পেয়ে গিয়ে মনেই থাকে না যে, ইচ্ছে করলেই, ভাঁজকরা ডানা দুটি মেললেই উড়ে যেতে পারি। আমাদের পতন রোধ করা আমাদেরই হাতে।

বিশ্বাস হল না তো? কাক পড়ে যাচ্ছিল। এটা, না মানুষের পড়ে যাওয়ার গল্পটা? মানুষের আবার ডানা কোথায়? আরে, ওটা তো প্রতীকী ডানা। বুকের

মধ্যে লুকোনো আছে। মেলে দেওয়ার অভ্যেস করতে হয়! ওর নাম পতিতোদ্ধারিণী ডানা!

পিকো-টুম্পাদের অদ্ভুত বাড়ির পকেটে আরও অনেক কেলেঙ্কারি—জগতের কুকুর-বেড়ালদের সঙ্গে যাদের আলাপ-পরিচয় আছে শুধু তাদের জন্যই এই গল্পটা আমার। ধরো, রাত্তিরবেলায় সরু হয়ে গ্রিলের জানলার ফাঁকে গলে, নিঃশব্দে আমাদের বিছানায় থুপ করে লাফিয়ে পড়েন, ... কে? আজ্ঞে না। বেড়াল নন। তিনি কুকুর। কুতুল। খুদে তিব্বতি কুকুর। মা ডাকেন ঝুমুরঝামুর। এক ফুট লম্বা, এক ফুট উঁচু, ঝাঁকড়া উলের তৈরি পুতুল যেন একটা। কুকুর+পুতুল=কুতুল। চোখ দুটো আর নাকটা সর্বদা চকচক করে। তিনটে কালো পুঁতির মতন। এবং একলা কুতুলই না, তার সঙ্গে লক্ষ্ণণ দোসর। তার ট্রেনিংপ্রাপ্ত ফুটো। ধবধবে সাদা গায়ে গোল-গোল কালো ফুট্‌কি, সদাচঞ্চল, সদানন্দ কুকুর, ভাল নাম ফুটকি। ডাক নাম ফুটো। আমরা বলি ডালমেশিয়াম। লোকে বলে নেড়ি মিক্সড। কেউ আমাদের গেটের মধ্যে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল সদ্য চোখফোটা ফুটোকে। সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াতো স্বাস্থোজ্জ্বল হাশিখুশি ফুটো। সেও তার গা সরু করে গ্রিলের ফাঁকে গলতে পারত। তাদের ট্রেনার ছিল রামকেষ্ট। রামকেষ্ট একটি মিনিবেড়াল। পিকো-টুম্পা তাকে কুড়িয়ে এনেছিল রাস্তার পাশ থেকে। নাম রাখা হল রামকেষ্ট। ওর নাম রামকেষ্ট রাখার সময়ে আমার ধারনা ছিল যে, বড় হলে ও মা-বেড়াল হয়ে যাবে। এই একটা অজ্ঞতা আছে আমার, জীবজন্তুদের জেন্ডার নির্ণয়ে আমি নেহাত অপারগ।

এর ফলেই এক হুমদো হুলোর নাম হয়েছিল মেম। তার চমৎকার সাদা-কালো-হলুদ বুটিদার জামদানি শাড়ি দেখে সবাই বলল, মিনি বেড়াল। ত্রিবর্ণ হুলো নাকি হাজারে একটা মেলে না। অত্যন্ত রেয়ার প্রাণী। কার্যত দেখা গেল, গোঁফ ফুলিয়ে ল্যাজ দুলিয়ে দুলকি চালে (হুলকি চালে?) পাঁচিলে পাঁচিলে চরণ চিহ্ন এঁকে বেড়াচ্ছেন তিনি, সংশয়াতীত হুলোসুলভ পদক্ষেপে। মার্কিন কনসুলেটে ডিনার খেতে গিয়ে তাকে এক গাড়ির তলায় লুকোতে দেখি, এবং সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে গাড়ির নীচে থেকে লম্বা হাত বাড়িয়ে তাকে উদ্ধার করি। রিক্তাদি ভয়ানক বকুনি দিলেন, অত ভাল শাড়িটা ধ্বংস হল বলে। সেই ছানার নাম মেম হবে না তে কী? কে জানত সে প্রকৃতপক্ষে সাহেব হয়ে দাঁড়াবে? এবং খুবই দুর্লভ একটি জীব? হাজারে একটা মেলে না। জামদানি বুটিদার পোশাকে 'মিস ইউনিভার্স' টাইপের চেহারা নিয়েও মেম যেমন হুলো হল, রামকেষ্ট হল ঠিক

তার উলটো। ছাইরঙা, গোমড়ামুখো, গোলগাল। স্বভাবটি অবশ্য মধুর, ঘরকুনো আর লাজুক আর ভিতু ভিতু। এই ভিতু স্বভাবের জন্যে আমাকে কি কম কষ্ট পেতে হয়েছে?

রাকেষ্টর বাচ্চা হল আমাদের বৈঠকখানা ঘরে, আমার কোলের মধ্যে, দু-চারজন গণ্যমান্য অতিথিকে সাক্ষী রেখে এক রবিবার সকালে। আমাদের বাড়িতে বেড়ালছানাদের জন্মানোর জন্য একটা সুবন্দোবস্তো আছে, একটা চাবিবন্ধ ঘরে। কাগজের বাক্সে কাপড়চোপড় বিছিয়ে সুন্দর আঁতুড়ঘরও তৈরি করেছি—কিন্তু রামকেষ্ট কিছুতেই সেখানে থাকবে না। এতে অন্য বেড়ালেরা খুব খুশি হত, একা একা দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাটে আপনমনে বাচ্চাগুলোকে ম্যাজিক করে হাজির করে ফেলত। ওই বাক্সতেই তারা থাকত, যতদিন না চোখ ফোটে। হুলোবেড়ালে ধরতে পারত না তাদের। ঘর চাবিবন্ধ থাকত। এহেন বিশেষ ব্যবস্থা রামকেষ্ট রিজেক্ট করে দিয়ে আমার কোলের মধ্যে এসে উঠল। আর নামল না। টুকটুক করে ম্যাজিক করে চার-চারটে বেড়ালছানা এসে পড়ল আমার কোলের মধ্যে। ছানা কোলে করে বসেই রইলুম, রামকেষ্ট ঘুমোচ্ছে। আমার বন্ধুরা কখন বোর হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। তাঁরা বেড়ালের প্রসূতিসদনে থাকতে রাজি হচ্ছেন না। বেড়ালের ধাই-মার এই বাধ্যকরী ভূমিকা থেকে মুক্তি পাওয়ারও কোনও উপায় ছিল না আমার। উৎসাহ কেবল পিকো-টুম্পার। দুই বোনে মহা আগ্রহে উবু হয়ে বসে বেড়ালছানার মর্ত্যে আগমন প্রত্যক্ষ করল। রামকেষ্ট নির্বিকার। বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে লাগল আমার কোলে শুয়ে-শুয়েই। এদিকে আমি খুব চঞ্চল স্বভাবের মানুষ, অতক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারি না। এরোপ্লেনে চড়ে দেশ-বিদেশে যাতায়াতে এটাই আমার সমস্যা। এক জায়গায় অতক্ষণ বসে থাকা। রামকেষ্টকে ছানাপোনাসুদ্ধ এবারে বাক্সে শুইয়ে দিলুম। আমাকেও তো নাইতে-খেতে হবে? না কেবল রামকেষ্টকে সার্ভিস দিলেই চলবে? মার্জার পরিষেবা প্রকল্পের অধ্যক্ষ?

বৈঠকখানাঘরেই মেঝেয় একটা গদি পেতে রাত্রে শুতুম আমি তখন। খেয়েদেয়ে এসে দেখি রামকেষ্ট আরাম করে সোফায় উঠে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। গভীর ঘুম। এবং বাচ্চা চারটেকে বাক্স থেকে বের করে এনে আমার বিছানাতে যত্ন করে শুইয়ে রেখেছে। তারপর শুরু হল রামকেষ্টতে আমাতে জেদের যুদ্ধ। আমি যতবার বাচ্চাদের বাক্সতে শুইয়ে দিই—রামকেষ্ট একটু পরেই তাদের একটা-একটা করে ঘাড় ধরে ঝুলিয়ে এনে আমার বিছানায় রেখে দেয়। তারপর

নিজে গিয়ে সোফাতে শুয়ে থাকে। দশদিন ধরে আমি ওই সদ্যোজাত বেড়ালছানাসমেত ঘুমিয়েছি, সরু হয়ে ভয়ে সিঁটকে, একপাশ ফিরে শুয়ে। পাছে ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে বাচ্চাগুলোকে চাপা দিয়ে ফেলি? আমি যে গালিভার আর ওরা তো লিলিপুট। আমার ভাল ঘুমই হত না। আরাম করে সোফায় ঘুমোত তাদের মা—রামকেষ্ট। আমার ওপরে কড়া নজর রাখত ঠিকমত খবরদারি করছি তো? দুধ খাওয়াতো আমারই বিছানায় এসে।

দশদিন ধরে রামকেষ্টর আঁতুড়ের আয়াগিরি করেছি। সে চারজন বিল্লি আর নেই। এখন যে কেলু আর ইয়েলু আছে, তারা পরবর্তী প্রজন্ম। রামকেষ্ট সেদিন অবধি ছিল, ক'দিন আর ওকে দেখছি না। জানি না, কোথাও চলে গেল কি না? কিন্তু আমার যে অতিথিরা সেদিনকার রামকেষ্টর সেই অপকীর্তির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁদের কল্যাণে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে বন্ধুদের হাসাহাসির আর শেষ নেই। পিকো-টুম্পাদের অদ্ভুত বাড়িতে সব উলটো—বেড়ালের কথা মানুষে শোনে। বন্ধুরা আমাকে খ্যাপায়, "আর বলিস না। তোর একদম পার্সোন্যালিটি ডিভেলপ করেনি—এমনকী, একটা বেড়ালেও তোকে ঘাড় ধরে তার খুশিমত কাজে লাগাতে পারে,"—"কী রে নবনীতা, বেড়ালের মিডওয়াইফগিরি বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে? ভাল। আমাদের বেড়ালের যখন ছানা হবে, তোকে ডাকব।" ভাগ্যিস পিকো-টুম্পা ছিল। তারা আমাকে একটুও খ্যাপায়নি বরং তারা খুবই গৌরবান্বিত যে, রামকেষ্টর এতখানি 'ট্রাস্ট' আমি নিজগুণে অর্জন করতে পেরেছি। "সে তোমাকে তার নিজের মা'র মতন করে ট্রিট করেছে!' পুরো একটা বাংলা বাক্য তো তোমরা কেউ আর বলো না। পিকো-টুম্পাও বলে না। কিন্তু ব্যাপারটার যে গোড়াতেই গলদ! এ-জগতের বেড়াল-মেয়েরা, কদাচ বাচ্চা হওয়ার জন্য বেড়াল-মায়ের কোলে গিয়ে বসে না। মানুষ-মেয়েরা তাদের মায়ের কাছে ছুটে যায়, ঠিক কথাই। আমিও ছুট্রে-ছুট্রে বিলেত থেকে কলকাতা অবধি চলে আসতুম আমার মায়ের কোলের কাছটি ঘেঁষে থাকতে পারব বলে, কিন্তু বেড়ালদের সমাজে এই ব্যবস্থার প্রচলন নেই। কেবল পিকো-টুম্পাদের অদ্ভুত বাড়িতে রামকেষ্ট নাম্নী অদ্ভুত মিনিবেড়াল এই প্রথা চালু করেছে।

তাই বলে কি রামকেষ্টর একটুও কৃতজ্ঞতাবোধ আছে? আজ্ঞে না। সে মাঝে এ-বাড়ি ত্যাগ করে ওই খাটালের টিনের চালে গিয়ে ডেরা গেড়েছিল। বিহারী দুধওয়ালারা খুব লোক ভাল, ওকে নিশ্চয় অনেক দুধ খাওয়াত। আমরা কত গিয়ে ডাকাডাকি করলুম, "আয় আয়, রামকেষ্ট, আয়, আয়—" পিকো-টুম্পা,

আমি, কানাই—প্রত্যেকে। কিন্তু রামকেষ্ট মুখ ঘুরিয়ে পেছন ফিরে বসেই রইল যেন ওর নাম রামকেষ্ট নয়। কিংবা কে না কে ডাকছে, কান দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু দুধওয়ালারা মাছ-মাংস খায় না, আর সন্ধেবেলা ঢোল বাজিয়ে রামায়ণ গায়। এদিকে রামকেষ্ট মাছ-মাংস ছাড়া ভাত খায় না, আর সন্ধেবেলা কানাইয়ের পাশে বসে টিভি দেখে। তাই কিছুদিন পরেই আপনাআপনি নির্লজ্জের মতন ফিরে এসে সোফায় শুয়ে রইল।

এই রামকেষ্টরই ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্রী কুতুল আর ফুটো দুই কুকুর। আমাদের সবার মতোই ওরাও রামকেষ্টর অন্ধ ভক্ত। আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে ন'মামণি একদিন চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে, ওরে, তোদের বেড়ালটা ইঁদুরের সঙ্গে যে চোর-পুলিশ খেলছে, আর শুধু তো বেড়ালই নয়, সঙ্গে হতচ্ছাড়া কুকুরগুলোও জুটে হুটোপাটি করছে।"

গিয়ে দেখি সত্যি কথা। একটা ইঁদুর বিব্রতভাবে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে, তিনদিকে তাকে পাহারা এবং তাড়া দিচ্ছে রামকেষ্ট, কুতুল আর ফুটো। হাবভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটা নিছকই খেলাধুলো হচ্ছে, ইঁদুরের আসলে প্রাণের ভয় নেই। কিন্তু ইঁদুর তো সেটা জানে না? আহ্লাদে গলায় ভুক ভুক শব্দ করছে ফুটো। বাকিরা খুশিখুশিভাবে ছোট্ট-ছোট্ট লাফঝাঁপ দিচ্ছে, কিন্তু ইঁদুরটাকে ছুঁচ্ছে না। মারা-ধরা তো দূর-অস্ত। ইঁদুর তবু ভয়েই আধমরা। সেই থেকে নজর করেছি ইঁদুরের সঙ্গে নিয়মিত এ-বাড়ির কুকুর-বেড়ালরা 'চোর-পুলিশ', নয়তো 'আই স্পাই' খেলে। কদাচ 'চু-কিত-কিত' খেলতে দেখিনি, কিংবা 'কবাডি'। কুস্তি কিংবা বক্সিংয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না। গান্ধীজি এ-বাড়িতে এলে খুব খুশি হতেন। এখানে প্রকৃতির নিয়মকানুনে জীবজগতে যেটুকু হিংস্রতা আছে, তাও আপনাআপনি ঘুচে গেছে। এ-বাড়ির জীবজন্তুরা তাদের বন্য স্বভাব ও প্রাকৃতিক ইনস্টিংক্ট সব ভুলে মেরে দিয়েছে। বাবার কুকুর দুষ্টু এবং মিঠু দু'জনেই বাবার সঙ্গে পান-জর্দা খেত, কালোজাম খেত, লোকে দেখে অবাক হত এই কুতুল আবার ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্যাডবেরির যম। আমার মা খুব মিষ্টি খেতে ভালবাসেন আর যখন যা খান কুতুলকে (মা ডাকেন ঝুমুর) খাওয়ান। ফুটোকে পাত্তা দেন না।

ফুটোরও নানা গুণাবলী আছে। প্রধানত পাহাড়ি ছাগলের মত সে উঁচুতে চড়তে পারে, সরু পাঁচিলে হেঁটে বেড়াতে পারে। এ-সবই রামকেষ্টর ট্রেনিং। অতি কচি বয়স থেকেই রামকেষ্ট তাকে নিজের দায়িত্বে শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছে। এখন ভীষণ মুশকিল হয়েছে, ছাদের আলসে দিয়ে রামকেষ্ট যদি হেঁটে বেড়ায়,

বেড়াল তো আফটার অল? তাতে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু যতই কার্নিসে হাঁটায় এক্সপার্ট হোক, ফুটোর শরীরটাও কম ওজন নয়, জাতেও সে কুকুর, ওর জন্যেই ভয় করে। কুতুলের এদিকে ইন্টারেস্ট নেই। ছাদেই সে ওঠে না। দোতলাতেও নামে না। সীতার গণ্ডি। ছাদে যাবে কী করে? শালিক পাখির ভয়েই তো সে আধমরা।

ও, সে-গল্প বুঝি বলিনি? পিকো-টুম্পাদের বিদঘুটে বাড়িতে যে পাখির ভয়ে কুকুর আধমরা। এটাও তো একটা খবর! পাখিটা ঈগল নয়, শকুনি নয়, চিল নয়, দাঁড়কাকও নয়, নেহাতই একটা খুদে শালিকপাখি। তাও মেয়ে পাখি। কিন্তু তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ যদি তোমরা দেখতে! উরিব্বাবা, ঠিক বম্বার প্লেনের মত ছোঁ মেরে নেমে এসে কুতুলকে ঠুকরে দিয়ে ওপরে উঠে যায়, তবে নিঃশব্দে নয়। প্রবল জোরে চেঁচিয়ে বকতে-বকতেই নামে,— ফলে কুতুল টের পেয়ে পালিয়ে আসতে পথ পায়। অত নিপাট ভালমানুষ কুকুর কুতুল, যার কোনও শত্রু নেই, বেড়ালরাও যাকে ফ্যাঁস করে না, কাকেরা যার সঙ্গে বাটি থেকে একসঙ্গেই মাংসভাত খায় (ভুটানির বা ফুটোর বাটি থেকে খাক দিকিনি? তারা কাছেই যেতে দেবে না) তাকে এই শালিকঠাকরুন এমন হিংস্র আক্রমণ করছেন কেন? কুতুলের বারান্দায় বের হওয়াই বন্ধ হয়ে গেল। বেরোলেই কোত্থেকে শালিকটা ড্রাইভ মেরে ওকে ঠুকরে দিতে আসে—আর ভয়ে কেঁপে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে এসে কুতুল খাটের তলায় লুকোয়। ''কুকুরকুলের কুলাঙ্গার তুই'' মা বলছেন, ''পাখির ভয়েই প্রাণান্ত?'' অথচ, কই, শালিকটা ফুটোকে তো আক্রমণ করে না? বরং ফুটোই কাকতাড়ুয়া স্বভাবের, ওরই খবরদারির চোটে বাড়িতে কাকপক্ষী বসবার জো নেই। অথচ ওকে তো তাড়া করে না শালিক? শান্তশিষ্ট, দাড়িবিশিষ্ট, সাধুপ্রকৃতির কুতুল শালিকের ক্ষতিটা কী করল? সে সসম্ভ্রমে আরশোলাদের পথ ছেড়ে দেয়, ইঁদুর দেখলে, একা থাকলেই লুকিয়ে পড়ে। ফুটো, রামকেষ্ট সঙ্গে থাকলে তবে খেলা করবার সাহস পায়। এহেন কুতুলকে এরকম অত্যাচার কেন?

মা রহস্যের কিনারা করে দিলেন। ঘুলঘুলিতে ক'টা শালিকছানা হয়েছিল। ও বাড়ির সাদা-হুলোটা ছাদে গিয়ে তাদের খেয়ে ফেলেছে। সন্তান হারিয়ে শালিকমায়ের ধারণা হয়েছে কুতুলই সেই খুনি বেড়াল। তাই সে খুনিকে সাজা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, হাল ছাড়েনি। বছর-বছর কতবার ছানা হল, কিন্তু শালিকমায়ের ভুল গোঁ এখনও গেল না। কুতুলকে এখনও সে তার শিশুহন্তারক খুনি বলে মনে করে। কুতুল যে কার্নিসে চড়ে ঘুলঘুলি থেকে পাখির ছানা চুরি করার

কায়দাকানুনই জানে না। তা ওকে কে বোঝাবে? পাখিরাও, এ-বাড়িতে বাসা বাঁধলে, কোনটা বেড়াল, কোনটা কুকুর, চিনতে পারে না। নইলে শালিকমায়ের এমন ভুল হয়?

"আপনাকে এই চেনা আমার ফুরাবে না।" এই লাইনটা এই বিদঘুটে বাড়ির প্রতিটি বাসিন্দার 'বানী'। "এই চেনারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।"—এটাই ঠিক। ফুটোর এই আপনাকে চেনার অবস্থাটা চরমে উঠেছিল। সে কখনও ভাবত সে মানুষ। একদিন আমি, অর্থাৎ পিকো-টুম্পার পূজনীয়া মাতৃদেবী, বাড়িতে ফিরে বেল বাজাতেই ফুটোর গলা পেলুম আহ্লাদি ভুক-ভুক। সাধারণত সে নীচে এসে আমাকে রিসিভ করে সিঁড়ির মাথায়। আজ অ্যাবসেন্ট। এবং আহ্লাদি ভুক-ভুকের সঙ্গে ডুয়েটে একটা বজ্রগর্জন—ভৌ। এ আবার কে রে বাবা? ওপরে এসে দেখি বসার ঘরে ফুটো মেঝেয় বসে, হিজ মাস্টার্স ভয়েসের ঢঙে আহ্লাদি গদগদ হয়ে ফটাস-ফটাস করে ল্যাজটা মার্বেল পাথরে আচড়াচ্ছে আদেখ্‌লের মতন—আর আমার বিছানাতে গদিয়ান হয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছেন হ্যাভক। সামনের বাড়ির প্রতিবেশী, বিশালবপু ডোবারম্যান। আমার দিকে বেশ ফ্রেন্ডলি বাদামি চোখ তুলে হ্যাভক বলল, "অয়ম অহম ভৌঃ!" ফুটো সগৌরবে বলল "ভুক"। অর্থাৎ, "দ্যাখো আমারও বন্ধু আছে। বৈঠকখানায় এসে বসিয়েছি। এবার রসগোল্লা-সিঙাড়া দাও?" হ্যাভক নামেও হ্যাভক, এবং রূপেও হ্যাভক, কিন্তু স্বভাবে হ্যাভক নয়। বেশ মিষ্টস্বভাব। যত বলি, " হ্যাভক, বাড়ি যাবে না?" "সোনা হ্যাভক, লক্ষ্মী হ্যাভক, আমার বিছানা থেকে নামো তো দেখি?" কিংবা "হ্যাভক, গো হোম," (বুড়োদা দেখি হ্যাভকের সঙ্গে ইংরেজি বলেন। ডোবারম্যান বোধহয় জার্মান কুকুর। কিন্তু সব কুকুরই ভাল ইংরেজি জানে।) "হ্যাভক গেট আউট" বলেও কিচ্ছু হল না। তখন বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে সিঁড়ি অবধি এনেছি, হ্যাভক হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে বিস্কুটটা খেয়ে নিল। এবং হাতটাও প্রায় খেয়ে ফেলছিল। তখন ছুটলাম বুড়োদার কাছে। তিনি এসে প্রচুর হাঁকডাক করে ফুটকির সম্মানিত অতিথিকে শেষপর্যন্ত গলায় শিকলি বেঁধে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। ফুটকি বন্ধ কোলাপসিব্‌লের ফাঁকে নাক গুঁজে দুঃখী-দুঃখী মুখে দাঁড়িয়ে রইল এ-বাড়িতে। দুই সখীর আড্ডা ভেঙে গেল। হ্যাভক নাম্নী মায়ের মেয়ের নাম টুটুল। ফুটকিরানির আর মা হওয়া হল না। সে তার আগেই যে পাখি হয়ে গেল। শুনেছি দুটি সারমেয়ীতে ভাব হয় না। ইংরেজিতে এমন একটা কথাই আছে, হিংসুটে প্রাণী হয়। কিন্তু ফুটো, কুতুল, হ্যাভক, ভুটানি এরা সকলেই মেয়ে কুকুর—প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের খুব ভাব। কেউ ঝগড়া

করে না। কুকুরের যেটা কাজ, খেয়োখেয়ি, সেটা কেউই করে না। হয়তো মানুষরাই ওটার এখন স্বত্ব সংরক্ষণ করছে। পিকো-টুম্পাদের উদ্ভট বাড়িতে কুকুর-বেড়াল একই বাটিতে দুধ খায়। এ ওর গায়ে ঠেস দিয়ে শীতের দিনে বারান্দায় রোদ পোহায়। একসঙ্গে ইঁদুরের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলে। নেহাত এ-বাড়িতে গরুও নেই, বাঘও নেই। আর ঘাটও নেই। যদি থাকত, তবে এ-বাড়ির পোষ্য বাঘে-গরুতে যে এক ঘাটে জল খেতই, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। সাপও নেই, নেউলও নেই। যদি থাকত তবে তারা গলা জড়াজড়ি করে টিভিতে কার্টুন দেখত নিশ্চয়ই। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মগুলি তারা সবই বিস্মৃত হয় এই সব্বোনেশে পরিবেশে—উড়ণচণ্ডে এই বাড়ির খপ্পরে পড়লে। এই আত্মবিস্মৃতির শেষ বড় ভয়ঙ্কর।

ফুটো তো পাহাড়ি ছাগলের মতো ছাদের পাঁচিলে হেঁটে বেড়াত। ছাদের আলসে দিয়ে তো ছুটত। যেজন্য ছাদের দরজা সর্বদা আমরা বন্ধ রাখতুম। কী জানি বাবা ফুটোটা কখন কী করে ফেলে। পাঁচিলের পাঁচ ইঞ্চি স্পেস একটা ধেড়ে কুকুরের হাঁটাচলার পক্ষে উচিত ঠাঁই নয়। সত্যি তো সে রামছাগল হয়ে জন্মায়নি?

একদিন পিকো-টুম্পার মা, মানে আমি, বাড়ি ফিরে দেখি দরজার কাছে ছোটখাটো ভিড়। সাইকেল ঠেস দিয়ে ছোকরা, ছাতা-বগলে বুড়ো, বাঁক কাঁধে ভারী, পুঁটলি আর বাচ্চা নিয়ে ভিখিরি-মা, এবাড়ি-ওবাড়ির কাজের লোকেরা প্রত্যেকে—পাড়ার ইলেকট্রিক মিস্তিরি, গাড়িসহ ইস্তিরিওলা, ঝাড়ুদার রঘু, যাদের কাউকেই ডাকলে পাওয়া যায় না.... এবং তার মধ্যে কানাই। কানাই চুপ করে সিঁড়িতে বসে আছে। অন্যেরা গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে কেউ বলে উঠল, "এই যে দিদি এসে গেছেন, দিদিকে জিজ্ঞেস কর।"

"কী?"

"আপনারা কেউ কি আপনাদের কুকুরকে আজ বকাঝকা করেছিলেন? কোনও অপমান?"

"কুকুর? কোন কুকুর? আপনি কি CSPCAর লোক?"

"না। আমি প্লাম্বার। ওই যে, সাদা কুকুরটা?"

"ফুটো? কই—বকিনি তো!"

জনতা হইচই করে উঠল, "বকেনি, বকেনি, অন্য কিছু। অন্য কোনও কারণে।

অপমান নয়।”

“কী হয়েছে বলুন তো? কানাই, কী হয়েছে?”

কানাই চুপ।

“আপনাদের কুকুর আজ সুইসাইড করেছে।”

“সুইসাইড?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে।”

“পা ফসকে।”

“না। ইচ্ছে করে। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। উল্টোদিকের ওই রকে আমরা বসে ছিলাম।”

“মোটেই আপনা আপনি পড়ে যায়নি। অ্যাকসিডেন্ট নয়।”

“স্পষ্ট দেখলাম ভলান্টারিলি ঝাঁপ দিল।”

“ডাইভ দিল। শূন্যে। খানিকটা টাইম নিয়ে, ছুটে এসে।”

“এমনও যে হয় কখনও দেখিনি, সত্যি! আশ্চর্য!”

“মনটা কি ওর আজ খারাপ ছিল? কেউ ওর মনে আঘাত দিয়েছিল?”

“কুকুরের মতো লয়্যাল প্রাণী হয় না, মনিব মারা গেলে খাওয়াই ছেড়ে দেয় শুনেছি। তবে এভাবে ঝাঁপ দিয়ে কুকুরের আত্মহত্যা....”

“আচ্ছা দিদি, ও কি আপনার মায়ের মৃত্যুতে খুবই ভেঙে পড়েছিল? বোধ হয় সেটাই...”

“গিনেস বুক অব রেকর্ডসে যাওয়ার মতন খবর বটে একটা। ‘মনিবের শোকে ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে কুকুরের সুইসাইড।’ এত লোকের এত কথা আমার আর সহ্য হচ্ছে না—সর্বনাশ হয়ে গেছে বুঝতে পারছি।

“কানাই, ছাদের দরজা বন্ধ ছিল না?”

মাথা-নিচু কানাই। চুপ।

“কানাই, ফুটো মরে গেল?”

কানাই মাথা-নিচু। কথা নেই। চোখে জল।

রঘু এগিয়ে এল। মাথা চুলকে বলল,

“কী হল দিদি, আমি তো উ বাড়ির থিকে সব দেখলম। পনছি পকড়নেকা লিয়ে অচানক এক লাফ মারল, ঔর সিধা কার্নিসসে একদম নীচে গির গইল, কানাই ডাগদর বাবুকো আনল—কিন্তু কুছু হইল না, বহুত আপসোসকি বাত...”

পাখি তাড়া করে ছোটা ফুটোর চিরকেলে স্বভাব। ‘কাগতাড়ানি’ বলে মা ওকে বকতেন। তা বলে সত্যি-সত্যি সে কাকের পিছু পিছু আকাশে উড়ে যাবে?

কুকুর হয়ে? এতটুকু জ্ঞান নেই?

কদমগাছের ডালে দোল-খাওয়া সেই কাকটা পড়ে যেতে যেতে ডানা মেলেছিল। ফুটো পারেনি। পতিতোদ্ধারিণী ডানা যে আমাদের মনের মধ্যে থাকে। শরীরে তো থাকে না। ফুটো পারেনি।

পিকো-টুম্পার বিদঘুটে বাড়ির ছাদের দরজাতে সেই থেকে একটা তালা ঝোলে। কুতুল-রামকেষ্টও আর ছাদে ওঠে না। শালিকপাখিটা কুতুলকে খ্যাপাতে এসে ফিরে যায়। হ্যাভক ফুটোকে খুঁজতে আসে গেটের কাছে।

এখন রোজ সকালবেলায় আমি, পিকো-টুম্পার মা যখন একা একা জানলার ধারে বসে কাগজ পড়ি আর চা খাই তখন আমার জানলার পাল্লার ওপরে একটা কাক নির্ভীকচিত্তে এসে বসে। আগে ফুটোর অভ্যেস ছিল আমার সঙ্গে চা-বিস্কুট খাওয়া। কুতুলের ওসবে রুচি নেই। ফুটো একদম কাকেদের ধারে কাছে ঘেঁষতে দিত না। এখন তো কাগতাড়ানি নেই। কাকেদের মজা।

রামভিখিরি কাক এইটে। ফিনান্স মিনিস্ট্রিতে থাকলে প্রচুর ফরেন এইড জোগাড় করে ফেলত। এসেই 'ক্যাও-ক্যাও-দ্যাও-দ্যাও' শুরু করে দেবে। আর একটু একটু করে দু'খানা বিস্কুটই খেয়ে নেবে। ফুটোর ভাগের বিস্কুট দু'খানা।

এই কাকটা আবার ময়নার মতন হরবোলা। বিস্কুট চাইবার ঢং তার রকম-রকমের। কখনও কোকিলের মতো মধুর কুহু স্বরে। কখনও ময়ূরের মতো কর্কশ কেকারবে, কখনও ঠিক রামকেষ্টর মিয়াঁও, কখনও হলুদপাখির টু-উইট, আবার কখনও অবিকল ফুটোর সেই আহ্লাদে ডাক, ভুক-ভুক।

বিদঘুটে বাড়ির বিদঘুটে কাক। নাকি সে কাকই নয় মোটে? আর কেউ?

প্রকাশকাল : ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

রুবাইয়ের বারান্দা আর বনপাহাড়ি

"এক যে আছে গহিন অরণ্য। অরণ্যের কোণে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো মস্ত একটা মর্মরপাথরের রাজবাড়ি। রাজবাড়িতে সাতটা মহলের সাতটা সিংহদুয়ারে সাত-সাতখানা হাতি বাঁধা আছে, মোটা রুপোর শেকলে। আর প্রত্যেকটা গেটে, মানে তোরণে, ঠিক মনুমেন্টের মতো, না, ঠিক দিল্লির কুতুব মিনারের মতো, দু'খানা করে বিরাট উঁচু মিনার (ওয়াচ টাওয়ার আর কি), তার মানে, সাত দু'গুণে চোদ্দটা ওয়াচ টাওয়ারের প্রত্যেকটার মাথায় দু'জন করে, অর্থাৎ চোদ্দ দু'গুণে আঠাশজন ষণ্ডাগণ্ডা সেপাই। তাদের মাথায় রঙিন সিল্কের বুটিদার রাজস্থানি উষ্ণীষ, ঘাড়ে বন্দুক ('উষ্ণীষ' কথাটা কি সুন্দর?)। সেপাইদের কিন্তু কোনওই কাজ নেই, তারা দিনরাত, রাতদিন শুধু ঘুমোচ্ছে। দেওয়ালে হেলান দিয়ে, এ ওর গলা জড়িয়ে, বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই। আর হাতিগুলো..."

"দিঁদিঁ! দিঁদিঁ কই? দিঁদিঁর কাঁছে দুঁধ খাঁব।"

ওঃ, বুবাই! ঘুম ভাঙলে আর এক মিনিট শান্তি দেবে না। দিদি যেই বাড়িতে ঢুকল, তো শুরু হয়ে যাবে দিদি কই, দিদি কই। রুবাই দৌড়ে বারান্দা থেকে ঘরে পালিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেয়।

হাতিগুলোও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে। ঠিক ঘুমোচ্ছে না, কিন্তু জেগেও নেই। থাকবে কেমন করে? ঘুমন্তপুরীতে সবাই তো ঘুমুচ্ছে। হাতিরা খিদেয় রোগা
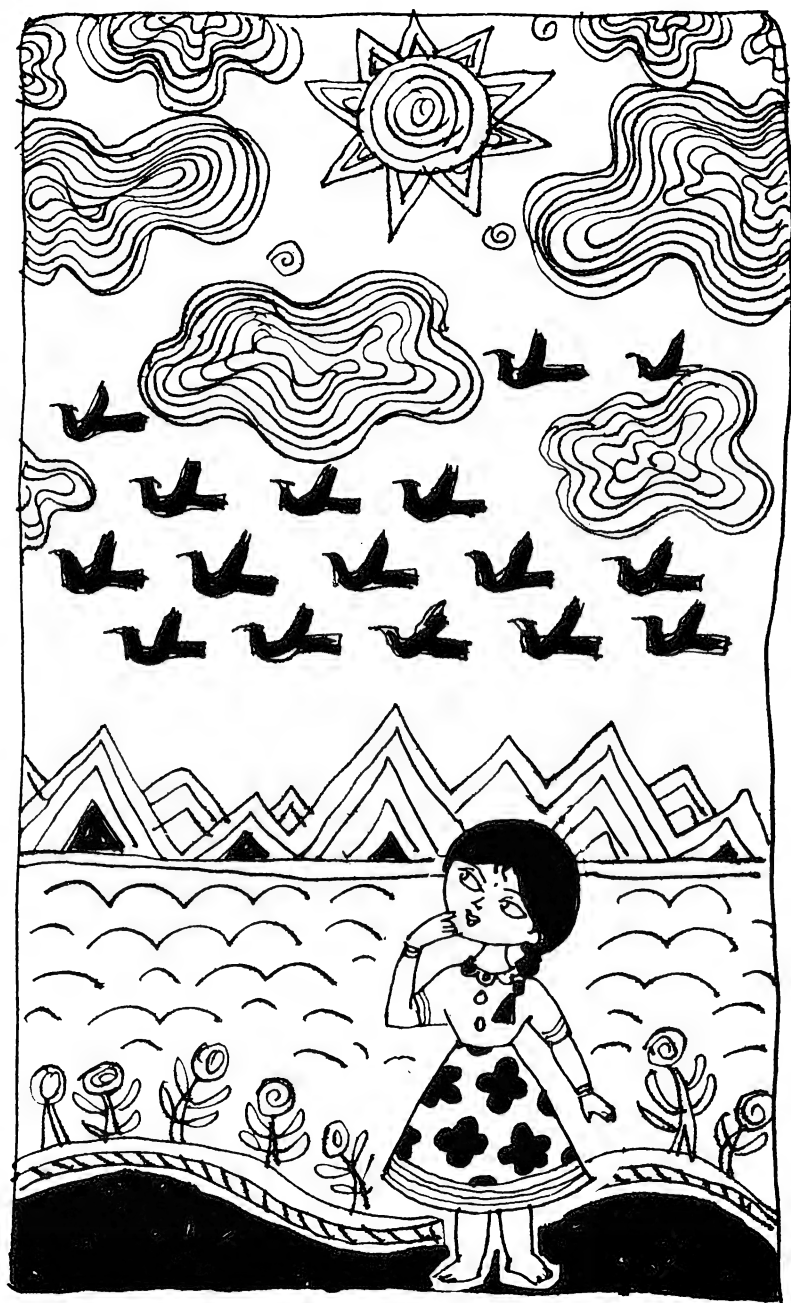
হয়ে গেছে। সরু হয়ে গেছে। তাদের হাড়পাঁজরা জিরজির করছে, ওই রামধনিয়ার গরুদের মতো। কতদিন খেতে পায়নি! রোগা-রোগা হাতি। সরু সরু হাতি। দেখলেই কান্না পায়। আহা, ওদের খুলে দিলেই ওরা বনে গিয়ে চরে খেতে পারে। কিন্তু শক্ত শেকলে করে বেঁধে রেখেছে যে ওদের! বাইরেটা সুন্দর হলে কী হবে, রাজবাড়িটাতে কোনও শ্রী নেই। ফাঁকা-ফাঁকা উঠোন, ঘাস নেই। উড়নচণ্ডে বাগান, ফুল নেই। ন্যাড়া-ন্যাড়া গাছ। ফল নেই। গাছে নতুন পাতা পর্যন্ত নেই। না আসে পাখি, না প্রজাপতি, না ভ্রমর, না কাঠবেড়ালি। ঘাসই নেই, পোকামাকড়, ফড়িংটড়িং যে আসবে, তারা থাকবে কোথায়? খাবে কী? রাজবাড়িটা পেল্লায়, ধবধবে সাদা পাথরে রোদ পিছলে পড়ছে। কিন্তু কোনও ছিরিছাঁদ নেই। একটিও জনপ্রাণী, কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত চোখে পড়ে না। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পেতলের কবজা-আঁটা চওড়া লোহার পাত-আঁটা কালো কাঠের তোড়ণদুয়ারগুলো সবসময় হাট করে খোলা। যার খুশি ঢুকে যেতে পারে। কিন্তু ঢোকে না কেউ। ওখানে যে ডাইনি-খোকার মায়াজাল বিছানো আছে। জীবজন্তুরা ঠিকই মনে মনে টের পেয়ে যায় কোথায় ডাইনি-খোকার মন্তর পড়া। শুধু মানুষগুলোই ঠকে। ডাইনি-খোকার চোখ অজগর সাপের চোখের মতো, ভয়ঙ্কর। ওই চোখে চোখ পড়লেই, ব্যস! ডাইনি-খোকা এক নিমেষে তার বিষমন্তর দিয়ে তোমাকে বশ করে নেবে। উড়ন্ত কালো ঘোড়ায় চড়ে সে হুশ-হুশ করে উড়ে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে। তার কাজই কেবল মানুষজনকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া, অকম্মা করে ফেলা। জীবজন্তুরা এসব খবর জানে, তাই তারা ওর ফাঁদে পড়ে না। ডাইনি-খোকার কপালের ওপর জটাজূট ঝুলছে। তার ভেতরে চোখ দুটো গরম লোহার ভাটার মতো ঘুরছে। আর নাকটা? উঃ নাকটা ঠিক টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো। বেঁকেচুরে ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। বিচ্ছিরি চেহারা ডাইনি-খোকার—ভীষণ কঠিন, নিষ্ঠুর। নির্মম মতন। অনেকটা ঠিক ওই কাপালিকদের যেমন দেখতে হয়, তেমনই আর কি!

"রুবাই," মা ডাকলেন, "রুবাই! এ কী! স্কুল থেকে এসেই শুয়ে পড়েছ খাটে? জামাকাপড় বদলে হাত মুখ ধুয়ে খাবে এসো। 'দিদি, দিদি' করে বুবাই কত ডাকল তোমাকে। খেলতে যাবে না? বুবাই রেডি হয়ে গেছে কখন।"

না। খেলতে যাবে না রুবাই। খেলতে গেলেই বড্ড ঝগড়াঝাটি হয় পার্কে। বাণ্টু ভীষণ ঝগড়া করে, বিশেষ করে বুবাইয়ের সঙ্গে। রুবাই ওদের থামাতে পারে না। বুবাইটা কেবল ছুটে আসে, 'দিদি, দিদি' করে। রুবাই বেচারি তখন কী

করবে? রোগা হলে কী হবে, লম্বা বলে বোধ হয় বাণ্টুর গায়ের জোর বেশি আর স্বভাবটাও বেজায় বুনো, অবাধ্য। এমনকী বয়সে বড় রুবাইকেও মাঝে-মাঝে এমন খ্যাপাতে শুরু করে দেয় বাণ্টু যে, অস্থির হয়ে বুবাইকে নিয়ে বাড়িতে পালিয়ে আসতে হয় রুবাইকে। বুবাইকে রোজ কাঁদায়, তবুও বোকা বুবাইটা রোজই খেলতে যেতে চায়। রুবাইয়ের খুব খারাপ লাগে। বুবাই বাড়িতে থাকতে ভালবাসে না। রোজ-রোজ বিকেলবেলায় ওর পার্কে যাওয়া চাই-ই। কিন্তু রুবাইয়ের ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটি, মারামারি ভীষণ বিশ্রী লাগে। বাণ্টুকে সামলানো পার্কে কারও কম্ম নয়, সে একটা দুর্দান্ত অবাধ্য বুনো ঘোড়ার মতো ছেলে। এত মারধোর খায় জেঠুর কাছে, এত শাস্তি পায় স্কুলে স্যারদের কাছে তবু তার শিক্ষা হয় না। বাণ্টুর মা-বাবা নেই কি না? পার্কে যেন তারই একচ্ছত্র রাজত্ব, সেখানে জেঠু নেই, স্যারেরা নেই।

রুবাই তার চেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে-মনে গল্প বানাতে পছন্দ করে। কিংবা নিজের খাটে শুয়ে-শুয়ে চোখ বুজে সিনেমা দেখতে। সিনেমাটাও নিজে-নিজেই বানিয়ে নেয় রুবাই। বুবাইকে গল্প বলতেও খুব ভালবাসে রুবাই। কিন্তু বুবাই যে গল্প শুনতে চায় না সবসময়। ওর মারামারিই পছন্দ। আর রুবাইয়ের গল্পে তো মারামারি নেই। রুবাইয়ের মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয় বাণ্টুকেই বুবাই বেশি পছন্দ করে কি না? বাণ্টু বয়সে রুবাইয়ের কাছাকাছি। তবু কেন যে ও ছোট ছেলেদের মারধোর করে, রুবাই বুঝতে পারে না। বাণ্টুর মা-বাবা থাকলে ও বেচারি নিশ্চয় এমন করত না। বাণ্টু যে জেঠিমার কাছে থাকে।

"রুবাই!" এবার মা'র গলা রাগী রাগী।

"যাই মা!" রুবাই ছোটে।

বুবাই-বাণ্টুরা ফুটবল খেলছে। রুবাইয়ের বন্ধুরা ওপাশে ব্যাডমিন্টন খেলছে। রুবাই খেলছে না। রুবাই দেখছে। খেলা দেখছে বলেই মনে করছে সবাই, কিন্তু রুবাই আসলে খেলা দেখছে না। রুবাই দেখছে নীল, বেগুনি আকাশে কমলা রঙের সূর্য। গোল একটা বেলুনের মতো ভেসে আছে। ফুলকো-ফুলকো রেশমি মেঠাইয়ের মতো গোলাপি, বেগুনি, কমলা রঙের হালকা হালকা মেঘ, নীল, বেগুনি সরু-সরু চিলতে-চিলতে ডুরে-ডুরে মেঘ আকাশময় ভেসে বেড়াচ্ছে, কিরি-কিরি কাটা ছুরির ধারের মতো কোনও-কোনও মেঘের ধারগুলো যেন কিরি-কিরি, কালো পুঁতির মালার মতো, —না, পুঁতি না, পদ্মফুলের বিচির মালার

মতো সারি-বাঁধা পাখি উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে, কিচিরমিচির ডাকতে ডাকতে। 'ব-লা-কা' কি ওকেই বলে? বলাকা তো বকের সারি। বক তো সাদা রঙের। এরা তো সবই কালো রঙের পাখি। তবে? এরা তবে বোধ হয় বক নয়। হাঁস। সুবচুনির সেই খোঁড়া হাঁসের মতো। উড়োহাঁস। বালিহাঁস। কাছ থেকে ওদের কেমন দেখতে কে জানে? কমলা রঙের সূর্য পশ্চিম দিকের নীল সরোবরে ভেসে আছে। ভেসে নেই, ডুবে যাচ্ছে। রোজ সূর্য ডুবে যায়। কিন্তু রোজ সূর্য ভেসে ওঠে না, শুধুই ওঠে। যা ডোবে, তাকে তো ভাসতে হবে আগে? কী জানি! চাঁদ, সূর্য, তারা—এরা সবাই কত লক্ষ-লক্ষ যোজন-যোজন মাইল দূরে, অথচ আলোটা কত কাছে। কী, আশ্চর্য না? এই আলো যেন টেলিফোনের মতো। দূরে, কিন্তু কাছে। উঃ, পিঁপড়ে! এই যে পিঁপড়েদের লাইন! লাইনটা, রুবাই ভাবে, এটাও তো মাটির তলা দিয়ে কত দূরে চলে যাচ্ছে। এটা পিঁপড়েদের বিশাল রাজ্যের হাইওয়ে, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। নীচে পিঁপড়েদের শহর আছে, অফিস আছে, কেল্লা আছে, কারখানা আছে, রাজা-রানি আছে, রাজার বাড়িও নিশ্চয় আছে, শ্রমিক আছে, মিস্ত্রিটিস্ত্রি সবই আছে। কী জানি স্কুল-কলেজও আছে কি না? পিঁপড়েদের সিনেমা হল, পিঁপড়েদের রেস্টুরেন্ট—আর পিঁপড়ে বাচ্চারা খেলা করবে বলে এইরকম পার্কও থাকতে পারে, সুড়ঙ্গ দিয়ে লুইস ক্যারলের সেই অ্যালিসের মতো যদি ঢুকে যাওয়া যেত! ইস, সে তো আর হওয়ার নয়। যাকগে!

সেই গহন অরণ্যের গল্পটায় সাতটা হাতি বাঁধা পড়ে আছে। ভুখা-ভুখা রোগা-রোগা হাতি, সেই গল্পটার শেষকালে, হাতিগুলোকে রাজকন্যা এসে খুলে দেবে। অনেক কলাগাছ এনে তাদের পেটভরে খেতে দেবে। দুঃখী হাতি থেকে তারা আবার মোটা-মোটা খুশি হাতি হয়ে যাবে—কিন্তু ডাইনি-খোকা তার কী হবে? তাকে, তাকে—নাঃ। রুবাই কাউকেই মেরে ফেলার কথা ভাবতে পারে না। অত যে দুষ্টু ডাইনি-খোকাটা, তাকেও না। ওকেও দুষ্টুমি সারিয়ে ভাল করে ফেলতে হবে। ও আর মন্দ ছেলে থাকবেই না। মন্দ না থাকলেই ওকে আর মরতে হবে না। কেন সব্বাইকে ঘুম পাড়াত ও? কেন অমন দুষ্টুমি করত? সব রাজ্যসুদ্ধু লোককে অকম্মা বানিয়ে দিত? কেননা একটা দুষ্টু রাক্ষস এসে ওর মা-বাবা দুজনকেই ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন খুব ছোট্টবেলায়—আর ওকে একটা চিলেকোঠায় মন্ত্র পড়ে ডাইনি বানিয়ে ফেলেছিল। সেই রাক্ষসের পাড়ানো কালঘুমটা আর ভাঙেনি। ওর বাবা-মা মরেই গেছেন। ওইজন্যই তো ডাইনি-খোকা বিশ্বসুদ্ধু সবাইয়ের ওপর রাগতে শুরু করেছে। সবাইকে ধরে ধরে জাদুবন্দি করে রাখছে। জাদুবন্দি থাকার সময়ে মানুষের খিদেতেষ্টা থাকে না, দশ বছর

ঘুমোলেই সেটা কালঘুম হয়ে যায়। আর ভাঙে না। শুধুই ঘুম পায়। হাতিরা তো মানুষ নয়, তাই ওদের খিদেও আছে, তেষ্টাও আছে। বড় তোড়ণের বাইরে মস্ত বড় শ্বেতপাথরের পদ্মফুল, ফোয়ারাতে জল উপচে পড়ছে দিনরাত। কিন্তু সেই জলে ডাইনি-খোকার মায়ামন্ত্র পড়া। সেই জল পশুপাখি খেলে ক্ষতি হবে না। কিন্তু মানুষ খেলেই সর্বনাশ! বুড়ো ডাইনির বিষমন্ত্রে এই বনে কোথাও এক ফোঁটাও জল নেই। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও উপায় নেই, তেষ্টায় পাগল হয়ে লোকে এসে প্রাণভরে ওই মন্ত্রপড়া জল খায়। আর ওই জলটা খেয়ে কত পথহারা পথিক যে লাল-নীল নুড়িপাথর হয়ে গেছে! তারা ওইরকম নুড়ি হয়ে ওই জলের মধ্যেই পড়ে আছে। কিন্তু কেউ যদি তাদের বের করে মাটির ওপর রাখে, তখনই তারা আবার মানুষ হয়ে যাবে, কিন্তু কেউ যে সে-কথা জানে না!

রাজবাড়ির মধ্যে রাজা আছেন। সিংহাসনে ঘুমন্ত। সভায় বসে। পাশে মন্ত্রী, ঘুমন্ত। সভাসদরা সবাই সেজেগুজে সভায় বসে গম্ভীর হয়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। রানি তার সখীদের সঙ্গে ঝুলবারান্দায় বসে চুল শুকোতে শুকোতে ঠাট্টা-মজা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এক বারান্দা সুন্দরী মেয়ে হাসিমুখে ঘুমিয়ে আছে ঝুলবারান্দার চন্দ্রাতপের নীচে। চন্দ্রাতপ কথাটা খুব সুন্দর। রুবাইয়ের খুব ভাল লাগে। রাজা-রানির একমাত্র মেয়ে, 'বনহরিণী'। রাজকন্যা বনহরিণী এখানে নেই। তার স্কুল দূরে পাহাড়ের ওপরে। এক বোর্ডিং স্কুল। রুবাইয়ের দাদা টুবাই যেমন খড়্গপুরে আই আই টি-তে বোর্ডিংয়ে থাকে, তেমনই। সে বেচারি জানেও না এদিকে তার মা-বাবার বাড়িতে কী ভয়ানক সব কাণ্ড হয়েছে! বনের মধ্যে রাজবাড়িতে ডাইনি-খোকা এসে সব লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে। সে বাবাকে চিঠি লেখে। সে মাকে চিঠি লেখে। কিন্তু কেউই উত্তর দেন না। দেবেন কী? চিঠিপত্র তো সব বাইরের তোরণের সামনে মস্ত রুপোর চিঠির বাক্সতে জমা হচ্ছে এক বছর ধরে। সেই পুজোর ছুটিতে....

"বাণ্টু, এই বাণ্টু, বুবাইকে শিগ্‌গির ছেড়ে দাও বলছি।" হঠাৎ রুবাই চেঁচিয়ে ওঠে। তার চোখ পড়ে যায় বাণ্টু বুবাইকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপরে চড়ে বসেছে। বুবাই দু'হাতে বল আঁকড়ে আছে। রুবাই দৌড়ে গিয়ে ছাড়িয়ে দেয়। বুবাই এবার কান্না শুরু করে। বাণ্টু ওর বলটা কেড়ে নিয়েছে।

"নেয় নিক গে, বুকে লাগেনি তো তোমার? আর একটা বল কিনে দেব

সোনা, তোমাকে ও বলটা দিয়ে খেলতে হবে না।'' রুবাই ভাইকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু বলটা তো বাণ্টুর নয়। বুবাইকে বড়মামুর দেওয়া জন্মদিনের উপহার। বুবাই দেবে কেন? সত্যি কথাই! ''বাণ্টু, বলটা ফেরত দাও। ওটা বুবাইয়ের জন্মদিনের পাওয়া।'' বাণ্টু কথা কানেই তোলে না। তার ভারী বয়ে গেছে। বলটা বাউন্স করাতে-করাতে মাঠের ও-প্রান্তে নিয়ে পালিয়ে যায় বাণ্টু। পিছু-পিছু রুবাই দৌড়য়। কাঁদতে-কাঁদতে বুবাই দৌড়য়, চিতু, জোজো, খোকন, সকলেই দৌড়য়। ''বাণ্টু, বলটা দিয়ে দাও বলছি!''

রাজকন্যে বাড়ি ফিরেছেন। ছুটতে-ছুটতে এসে দরজায় দেখেন, এ কী! ফুলের মালা নেই, আম্রপল্লব নেই, তোরণ সাজানো হয়নি। তোরণে সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, বাজনা বাজছে না, তোপ পড়ছে না, আর রোগা-রোগা হাতিটি শিকলি বাঁধা, দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। তবু রাজকন্যেকে দেখেই শুঁড় তুলে 'বৃংহিত ধ্বনি' করে সে জানান দিল অন্য হাতিদের যে, রাজকন্যে বাড়ি এসেছেন। হাতির চেহারা দেখে তো রাজকন্যের কান্না পেয়ে গেল। ''ওগো শ্যামপিয়ারী, কী করে তুমি এত রোগা হলে? পাঁজরের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, অস্থিপঞ্জরসর্বস্ব? এত দুর্বল, যেন দাঁড়াতে পারছ না?''

রাজকন্যে হাত বুলিয়ে দিলেন শ্যামপিয়ারীর গায়ে। হাতির ছোট-ছোট চোখ দিয়ে টপটপ করে বড়-বড় জলের ফোঁটা পড়ল। রাজকন্যে হাতির পা থেকে শিকলি খুলে দিলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমার মাহুত কোথায়? তোমার কি অসুখ করেছে শ্যামপিয়ারী?''

আর মাহুত! মাহুতরা তো পিলখানাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এক বছর ধরে। সাতজনেরই এক অবস্থা। দোরে-দোরে গিয়ে হাতিদের প্রত্যেককেই রাজকন্যে খুলে দিলেন। একটা বিশাল দাঁড়কাক এসে সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে রোগা হাতিটাকে ভীষণ বিরক্ত করতে লাগল। ঠুকরে-ঠুকরে পাগল করে দিচ্ছে বেচারিকে। রাজকন্যে দেখলেন ফোয়ারাতে জলের পাত্রভর্তি অজস্র রঙিন নুড়ি পাথর। একটা রামধনু রঙের নুড়ি পাথর তুলে যেই কাকটার দিকে ছুঁড়ে মেরেছেন, কাক তো উড়ে গেল। কিন্তু মাটিতে খাড়া হয়ে গেল একজন কাঠুরে। কাঁধে কুড়ুল। কোমরে গামছা। বাতাস ফুঁড়ে বেরোল না কি?

''আরে! তুমি আবার কোথা থেকে এলে?''

''আমি? ওই নুড়ি থেকে।''

রাজকন্যে তো অবাক!

''মানে?''

তখন কাঠুরে সব ব্যাপার রাজকন্যেকে খুলে বলল। যেই সে মন্ত্রপড়া জল খেয়েছে, আর ম্যাজিকের চোটে নুড়ি হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই ডাইনি-খোকার মন্ত্রের খবরও মনে-মনেই জানতে পেরে গেছে। জাদুমন্ত্রে তেমনই নিয়ম। ডাইনি-খোকা এখন অন্য একটা দেশে। কিন্তু প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতে সে এসে নতুন করে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে যায়, কেননা দিনে-দিনে জাদুমন্ত্রের জোর ক্রমশ কমে আসে।

পূর্ণিমার আর মোটে একদিন বাকি। ডাইনির আসার সময় হয়েছে। কাঠুরে বলল, "জলের এই সমস্ত নুড়িরাই পথভোলা মানুষ। ওদের জল থেকে বের করে শুকনো মাটিতে রাখলেই জাদু কেটে যাবে।"

তখন রাজকন্যে আর কাঠুরে মিলে জল থেকে রঙিন নুড়িগুলো সব বের করে শুকনো ধুলোয় ফেলল। আহা, কত রকমের মানুষই যে হল! তারা সবাই প্রাণ ফিরে পেয়ে দু'হাত তুলে রাজকন্যেকে আশীর্বাদ করতে করতে যে যার বাড়িতে—

"রুবাই, আবার শুয়ে পড়লে না খেয়ে? বুবাই পর্যন্ত জেগে আছে, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে? ছি ছি, তুমি না দিদি?"

রুবাই মোটেই ঘুমায়নি। কিন্তু মাকে সে কিছু বলে না। বলে লাভ নেই। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে যখন, তখন মা তো বলতেই পারেন। এবার উঠে খেতে বসতে হবে। ন'টা বাজে। মা কিছু জানেনই না রুবাই কী করছে!

ডাইনি-খোকা আসছে। হুশ-হুশ করে শব্দ হচ্ছে তার উড়ন্ত ঘোড়ার কালো ডানার। জোছনায় বনে যেন বান ডেকেছে। কাঠুরে বলেছে ডাইনির নিজের জাদুমন্ত্র যে-জলে মাখানো আছে—সেই জলটা তার গায়ে হাতির শুঁড় দিয়ে ছিটিয়ে দিলেই তার ডাইনি-মন্তর সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তো হাতিদের ওই অবস্থা করেছে। পাছে ওরা গায়ে জল দেয়, সেই ভয়েই তো হাতিদের সে বেঁধে রাখত। রাজকন্যে এদিকে তোরণের হাতিদের শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছেন কালকে কী করতে হবে। কালো ঘোড়া থামল। ডাইনি-খোকা তার জটা দুলিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দেখে, তোরণের দরজা বন্ধ। আরে, দরজা বন্ধ কেন? অবাক হওয়া মাত্রই ঝুপ্পুস করে তার গায়ে সাত পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল যেন। সাত-সাতটা হাতি সাত শুঁড়ভর্তি মন্ত্রপড়া জল নিয়ে ডাইনি-খোকার গায়ে আর তার উড়ন ঘোড়ার গা-ময় ছিটিয়ে দিয়েছে।

অমনই বনের ভেতর একটা বিদ্যুত চমকানির মতো জোর আলোর ঝলক উঠল, আর ডাইনির সমস্ত জাদুমন্ত্র সেই মুহূর্তে ফুস করে কেটে গেল। চোদ্দটা মিনারের মাথায় আঠাশ ঘুমন্ত সেপাই জেগে উঠে একসঙ্গে গর্জন করে উঠল, "কে যায়? কে যায়? কে যায়?"

"খবর্দার!"

সেও যেন বাজ পড়ার মতো শোনাল, এমনই নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজপুরী।

জেগে উঠল দরজার পাশে বৃদ্ধ প্রহরী। রাজকন্যেকে দেখে সে হেসে বলল, "আরে রাজকন্যে বনহরিণী, কখন ইস্কুল থেকে এলে ভাই? তোরণ যে এখনও সাজানো হয়নি? তোপও তো দাগা হল না?" বলতে-বলতে প্রহরী দৌড়ে তোপ দাগতে গেল। রাজকন্যে বাড়ি আসার দিনে এটা নিয়ম কিনা? তোপের শব্দে রাজসভায় রাজা জেগে উঠে বললেন, "মন্ত্রী, তোপ কেন দাগল? ব্যাপার কী? আমরা কি কোনও যুদ্ধ জিতলাম?"

তোপের শব্দে ঝুলবারান্দায় রানি জেগে উঠে বললেন, "সখী তোপ কেন দাগল? ব্যাপার কী? রাজকন্যে বনহরিণীর কি তবে ঘরে আসার দিন আজকে?"

তোপের শব্দে ডাইনি-খোকার কানে তালা লাগল। তার জাদুর ঘোড়া কাগজের ঘোড়া হয়ে মাটিতে চ্যাপটা হয়ে পড়ে গেল। ডাইনি-খোকা দু'হাতে কান চেপে ধরে চোখ বুজে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়ল। সে তখন একটা কোঁকড়া চুলের, টিকলো নাকের, বড়-বড় চোখের রোগা লম্বা ছোট ছেলে হয়ে গেছে। তার মা নেই। তার বাবা নেই। রাক্ষসের পুষ্যিপুত্তুর হয়ে সে এরকম রাক্ষুসে ডাইনি-মন্তর শিখে ডাইনি সেজে ছিল। জাদুমুক্তির মুহূর্তে সবকিছুই ভুলে গেছে। তার মা'র জন্য, বাবার জন্য মন কেমন করছে। রাজকন্যে বনহরিণী তাকে হাত ধরে দাঁড় করালেন। অনেকটা বাণ্টুর মতো দেখাচ্ছে ছেলেটাকে।

"তোমার নাম কী?"

"বনপাহাড়ি," সে বলল।

"তোমার দেশ কোথায় বনপাহাড়ি?"

"নেই।"

"তবে তুমি এখানেই থাকো।" রাজকন্যে ভাবলেন রাজবাড়িতে তো এতদিন কোনও রাজপুত্তুর ছিল না। এবার থেকে—

"রুবাই, রুবাই, এখনও শুলে না?" মা তাড়া লাগাচ্ছেন।

"কী করছ তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে, অন্ধকারে? বারান্দাতে? ঘরে এদিকে আলো জ্বলছে, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো শিগ্‌গির। কাল সকালে স্কুল আছে না?"

"যাই, মা।" রুবাই নিজের মনে একটু হেসে ঘরে এসে আলো নিভিয়ে দেয়।
"গুডনাইট, বনপাহাড়ি। সুইট ড্রিমস্।"

প্রকাশকাল : ১৪০০ বঙ্গাব্দ

কায়াক

কৌশিকী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। নৌকো দেখছিল। পরশুদিন সে যখনই এখানে এসে পৌঁছল, তখনই টুকুদির মা বললেন, "ওই যে! ওই যে! দ্যাখো কৌশিকী, কত নৌকো যায় এখান দিয়ে! দেখে-দেখে যেন আমার আশ মেটে না?"

টুকুদিদির মা একটু আদেখলে টাইপের। নৌকো দেখার শখ মিটছে না তাঁর! বয়েস তো কম হল না?

টুকুদিদি এ-দেশে কলেজে পড়ছে। কৌশিকী এই প্রথম এসেছে আমেরিকাতে, যদিও তার কিছুই খুব একটা অচেনা মনে হচ্ছে না, সবই যেন সিনেমায় দেখেছে আগে। তবে রাস্তা-ঘাটে সকলেই যে শুধু সাহেব-মেম, এটা বেশ অস্বস্তিকর। হঠাৎ মাকে ভীষণ কালো মনে হচ্ছে, অথচ মা-তো এমন কিছু কালো নন, কৌশিকীর মতো ফরসা না হলেও। অবশ্য সাহেবদের গায়ের রঙের তুলনায় কৌশিকীও বোধহয় কালোই হবে? কে জানে! নিজে তো নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না সে রাস্তাঘাটে!

দেশ বটে একটা! পথের লোকজন শুধু ফুটপাথ দিয়ে হাঁটে! ঠিকমতো দাগ দেওয়া জায়গা দিয়েই রাস্তা পার হয়, এমনকী কুকুরগুলো পর্যন্ত আলোর সঙ্কেত জানে বলে মনে হচ্ছে। কাল একটা কুকুর রাস্তার আলোয় দাঁড়িয়ে ছিল। এখানে মানুষদের জন্যও ট্র্যাফিক লাইট আছে, লাল রঙের আলোয় লেখা থাকে, "DON'T WALK " তারপর সাদা রঙে ফের আলোয় লেখা জ্বলে ওঠে: "WALK". কুকুরটার সঙ্গে একজন অন্ধ মানুষ ছিলেন সাদা ছড়ি হাতে আর কালো চশমা

চোখে। কুকুরই তাঁকে দিব্যি রাস্তা ক্রস করিয়ে নিয়ে গেল। নৌকোর চেয়ে কৌশিকীর ওটা বেশি ভাল লেগেছে।

এমন সময়ে টুকুদিদির মা বললেন, "কৌশিকী, ওই দ্যাখো রোয়িং করছে।"

কৌশিকী ফিরে তাকিয়ে, মাথা নেড়ে তাঁকে জবাব দিল, "ওটা রো-বোট নয়। ওটা তো কায়াক।"

তিনি চোখ গোল-গোল করে বললেন, "কায়াক? কায়াক আবার কী? সে তো এস্কিমোদের থাকে শুনেছি।"

কৌশিকী গম্ভীর মুখে জ্ঞান দিতে লাগল, "কায়াকে কেবল একজনই যাত্রী থাকে, ব্যস! ক্যানোতে একাধিক থাকতে পারে কিন্তু চারজনের বেশি নয়, রো-বোটে ছ'জন-আটজন মিলে রোয়িং করে।" কৌশিকী যা যা বলল, সেগুলো কিন্তু সব ঠিকঠাক কি না, তা সে জানে না। কিন্তু তার মনে মনে এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল, সেইটেই সে টুকুদিদির মাকে জানায়। টুকুদিদির মা যদিও প্রোফেসারি করেন, তারই মায়ের মতো, তবু এসব খবর জানতেন বলে মনে হল না। বড়-বড় চোখ করে বললেন, "সত্যি? তোরা আজকাল কত কী জানিস রে! আমরা তো ওই বয়েসে এর আদ্ধেকও জানতুম না!"

কৌশিকী মনে মনে বলে, 'এই বয়েসেও জানো না!' কিন্তু মুখে কিছু না বলে শুধু হাসে।

মা কোথায় গেলেন? চা করতে নিশ্চয়। মায়ের সব তাতে বাড়াবাড়ি। অন্যের বাড়িতে এসে তোমাকে চা করতে হবে কেন? শুধু কি চা? কাল তো জোর করে বাসন মাজতে গিয়েছিলেন। টুকুদিদির মা হেসে বললেন, "মেশিনেই মেজে দেবে, ডিশওয়াশার আছে! রেখে দাও।"

কৌশিকীর খুব ইচ্ছে করল ডিশওয়াশার কীভাবে বাসনগুলোকে মাজে, সেটা দেখতে। মেশিনে তো কাপ ডিশ সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, নোংরা পরিষ্কার হবে কেমন করে? ভেতরে কী ব্রাশ আছে? ন্যাতা আছে? হাত আছে নাকি দুটো? ইচ্ছে করলেও কৌশিকী সেটা মুখে কখনওই বলবে না, সে তো আদেখলে নয় টুকুদিদির মায়ের মতো।

এবারে কৌশিকীর মা বললেন, "ডিশওয়াশার যে কেমন করে ডিশ ওয়াশ করে, আমি কিছুতেই ভেবে পাই না, মেশিনে কাপড় কাচা তবু বুঝতে পারি, কিন্তু বাসন মাজা?"

"এই তো," বলে টুকুদিদির মা মেশিনটা খুলে দেখালেন কীভাবে বাসনগুলো সাজিয়ে ভরতে হয়, তারপর সাবান দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর কিছুই

দেখা গেল না ভেতরে কী কাজকর্ম চলছে। কেবল খুব ঘষঘষ শব্দটব্দ হতে লাগল। মেশিন যে চলছে, সেটা বুঝতে দিতে হবে তো? দূর, কিছুই বোঝা গেল না ওতে। তবে ওরই মধ্যে কৌশিকী দেখতে পেল, প্রথমে প্রত্যেকটা জিনিস থেকে ভাল করে সব এঁটো খাবারদাবার ধুয়ে ফেলা হল গরম জল দিয়ে। তবে আর সাবান দিয়ে মেজে নিতেই বা কষ্টটা কী ছিল? জল আর এঁটো বাসন তো ঘাঁটতেই হচ্ছে, এ-মেশিনের মানে কী?

কৌশিকী বেড়াতে এসেছে। না, বেড়াতে ঠিক নয়। বাবার কাছে থাকতে এসেছে। এখান থেকে ওরা এক সপ্তাহ পরেই কানাডাতে চলে যাবে। সেখানেই থাকবে কৌশিকীরা। বাবা, দু'বছর আগে কানাডায় চলে এসেছেন। মা এতদিনে দেশের সব ব্যবস্থা করে এলেন। ঠাকুমাকে ভাল দেখে একটা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতে হল তো? বাড়িটা তো বিক্রি করে দিয়ে এসেছে কৌশিকীরা। ঠাকুমাকে এ দেশে এই-বয়েসে আনা সুবিধের হবে না। তাঁর পুজোআচ্চা আছে, ছোঁয়ান্যাপা আছে। (মা বলেন 'ছোঁয়ান্যাপা মানে আর কি, শুচিবাই!) এখানে লোকে গরু খায়, শুয়োর খায়। (আহা, দেশে যেন খায় না! হ্যাম খায়নি কৌশিকী? আর কাবাব রোল? কিন্তু ঠাকুমা জানেন না!)

চা হাতে সকলে বারান্দায় এসে বসল। টুকুদিদির মা গরম-গরম চপ ভেজেছেন, টুনুফিসের চপ, ঠিক দেশের মাছের মতোই মনে হচ্ছে, তবে একটু আঁশটে গন্ধ। আর ডালমুটও বানিয়েছেন, এখানকারই নানারকম মিশেল। মুড়ির মতন ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল, আর কুচো-কুচো নোনতা বিস্কুট, আর চিনেবাদাম, কাজুবাদাম, কিশমিশ, নুন, হলুদ, লঙ্কা, সর্ষে ফোরন দিয়ে কী সুন্দর ডালমুট তৈরি হয়ে গেল! মা ভাল দার্জিলিং চা এনেছেন দেশ থেকে, তাই দিয়ে খাওয়া হবে।

কৌশিকী চা খেতে ভাবাসে না, যদিও বারণ নেই, তেরো বছর বয়েস তো কম নয়? চা খায় তার বন্ধুরা অনেকেই।

কৌশিকীর জন্য চকোলেট মিশিয়ে ঠাণ্ডা দুধ, আঃ কী সুন্দর খেতে! মিল্ক শেকের মতো অনেকটা। ডালমুটটা খেতে গিয়ে কৌশিকীর ঠাকুমার জন্য একটু মন কেমন করল। ছোঁয়ান্যাপা যতই থাক, ঠাকুমা এখনও ডালমুট দিয়ে চা খেতে ভালবাসেন। শক্ত ডাল খেতে পারেন না বলে তাঁর জন্য মা ঝুরিভাজা কিনে আনেন, ডালমুটের বদলে সেটা খাওয়া সহজ। নামকরা দোকান থেকে আনলে ঠাকুমা খান। বৃদ্ধাশ্রমে ঠাকুমার জন্য কে এনে দেবে ঝুরিভাজা?

"বারান্দাটা সত্যি ভারী চমৎকার," মা বললেন, "বিশ্বাস হয় না ঘরে বসে

এইসব দৃশ্য দেখছি—নদীতে নৌকো ভেসে যাচ্ছে, লোকজন নদীর ধারে বেড়াচ্ছে।"

'আশ্চর্য বাবা!' কৌশিকী মনে-মনে বলে। মা আবার লোকজনকে বেড়াতে দেখলেন কোথায়? সবাই তো দৌড়োচ্ছে। কৌশিকী এসে অবধি বারান্দায়। আর খুবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে চারধার। একজন লোকও হাঁটছে না। লেকের ধারে কত লোকে হেঁটে বেড়ায়, কত লোক বসে থাকে। এরা সবাই শুধু ছুটছে। প্রথমে ভেবেছিল কোনও রেসের জন্য প্র্যাকটিস করছে বুঝি। তারপর দেখছে দৌড়বীরদের সীমাসংখ্যা নেই। তখন জিজ্ঞেস করতেই হল। ওই টুকুদিদির মাকেই! আবার কাকে?

উনি বললেন, "ওরা সব জগিং করছে। এখানে সকলে এখন ভীষণ স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন, শরীর-শরীর করে ব্যতিব্যস্ত, সে ষোলো বছরের ছেলেমেয়ে যেমন, ছিয়াত্তর বছরের বুড়োবুড়িও তেমনই। আবার 'বুড়োবুড়ি' বলা কিন্তু চলবে না, কানা-খোঁড়াকে যেমন কানা-খোঁড়া বলা চলবে না, জানো তো? খবর্দার, যেন এখানে কালা-বোবাদের প্রসঙ্গে 'ডেফ-মিউট' এসব বলে ফেলবে না, সে-সমস্ত ভাষা এখন এক্কেবারে অচল হয়ে গেছে। 'পোলিটিক্যালি ইনকরেক্ট' বুঝেছো? বুড়োবুড়িদের বলবে, 'সিনিয়ার সিটিজেন'। বোবাকে বোবা বলবে না, বলবে, 'স্পিচ ইম্‌পেয়ার্‌ড'। কালাকে বলবে, 'হিয়ারিং ইম্‌পেয়ার্‌ড'।"

আর অন্ধকে? ব্লাইন্ড বলাও বারণ? তবে 'ব্লাইন্ড স্কুলকে' কী বলে এরা? কৌশিকীর ভীষণ অবাক লেগেছিল। কী আশ্চর্য দেশ রে বাবা! সামানাসামনি না হয় কালাকে কালা, বোবাকে বোবা বলে না, তাই শব্দগুলো মোটে ব্যবহারই হবে না? ইংরেজি ভাষার ডিকশনারি থেকে উঠেই যাবে? দৌড়ে দৌড়ে শরীর সারাচ্ছে! হুঁঃ। এত সুন্দর নদীটা, একজন লোকও দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছে না? সবাই বিশুদ্ধ বায়ুতে ব্যায়াম করছে কেবল? সত্যি! কতরকমের দৌড়! বেশিরভাগই ছুটছে নিজের পায়ে। কেউ আবার পায়ে চাকা বেঁধেছে। কেউ একটা কাঠের তক্তার ওপর দু'পায়ে দাঁড়িয়ে ছুটছে, তাতে চারটে চাকা আছে। তাতে চড়েই দিব্যি হুস-হুস করে রাস্তা পার হচ্ছে! দেখেই ভয় করছে কৌশিকীর। যদি পড়ে যায়? আর-একদল দু'পায়ে সরু সরু দুটো জিনিসে চারটে করে চাকা বেঁধে ব্যালান্স করে ছুটছে। তার নাম 'রোলার স্কেট'। এগুলো শাঁ-শাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। স্পীড কী! দেশে 'রোলার-স্কেট' দেখেছে কৌশিকী। পায়ে বাঁধার চাকাওলা ছোট্ট-ছোট্ট গাড়ির মতো, এটা অন্য জিনিস। পাশাপাশি চারটে চাকা এক সারিতে। আগের দিন ডাকাতরা রণপা বেঁধে ডাকাতি করতে যেত, এরা তো দিব্যি রোথার

ব্লেড বেঁধে ছিনতাই করতে পারে? সন্ধেবেলা নদীর ধারটা বেশ সুনসান হয়ে আসে।

আর সন্ধে? বাবাঃ। এ-দেশে সন্ধে হতেই চায় না! সূর্য ডুবতে-ডুবতে সাতটা বেজে যায়। আর আলো কমতে-কমতে সাড়ে ন'টা-দশটা। রাত দশটায় মনে হবে বুঝি সন্ধে ছ'টা বাজে। অতএব, সন্ধে বলে কৌশিকীর কাল যেটা মনে হয়েছিল, সেটা, তার মানে বেশ গভীর রাত্রিই হবে আসলে। তাই সুনসান। ও, একটু তো সময় লাগবেই ব্যাপারস্যাপার বুঝতে। নতুন জায়গা, নতুন দেশ।

কানাডাতে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হবে কৌশিকী। এখানে নাকি স্কুলে ভর্তি হওয়ায় দেশের মতো 'ভজকট' নেই। দেশে তো কোথাও অ্যাডমিশন পাওয়া মানে হাতে-স্বর্গ-পাওয়ার মতো। (এই 'হাতে-স্বর্গ-পাওয়া' কথাটা কী বাজে, না? কোনও মানেই হয় না। স্বর্গ কি একশোয় একশো? আর স্বর্গে যাওয়াটাও কিছু কাজের কথা নয়, কেউ সেধে স্বর্গে যেতে চায় কি? ওটা মোটেও একটা বেড়াতে যাওয়ার মতো জায়গা নয়! বাংলায় বড্ড স্বর্গ-স্বর্গ বলার বাতিক আছে। যেন ওটাই সবচেয়ে ভাল জিনিস। অথচ কেউই তো যেচে তাদের প্রিয়জনদের স্বর্গে পাঠাতে চায় না।

এই স্বর্গ-টর্গ নিয়ে ভাবতে গিয়ে ঠাকুমার মুখটা মনে পড়ল। দাদুভাই স্বর্গে যাওয়ার পর থেকেই ঠাকুমার এইসব পুজোআচ্চা আর ছোঁয়ান্যাপা বেড়েছে। আর করবেনটাই-বা কী? দাদুভাইকে দেখাশোনা করা ছাড়া তাঁর কোনও কাজ ছিল!

কৌশিকীর মা বাবা ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু বিন্দুদি সবই করতে পারে। দু'বেলা ভারতী এসে বাসন মেজে, কাপড় কেচে, মেঝে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, বিন্দুদি রান্না করে, খেতে দেয়, ঘরদোর গুছিয়ে রাখে। কাপড়-জামা গুছিয়ে রাখে। ইস্ত্রি করিয়ে আনে। কৌশিকীর টিফিন তৈরি করে দেয়। মাকে ও খুব যত্ন করে। বিন্দুদি এখন অন্যদের বাড়িতে কাজ করতে চলে গেছে। কৌশিকীদের আর বাড়িই নেই, তো বিন্দুদি! ঠাকুমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে কৌশিকীও গিয়েছিল। আরও অনেক বৃদ্ধা আছেন সেখানে। আলাপ হল। অনেকেরই ছেলেমেয়েরা আমেরিকায়, কানাডায়। তাঁরা নিয়মিত টাকাকড়ি পাঠান, যাতে মায়ের কোনও অসুবিধে না হয়। কেউ-কেউ মাঝে-মাঝে আবার বেড়াতেও নিয়ে যান মাকে দু-চার মাসের জন্য।

কৌশিকীর মায়েরও ইচ্ছে আছে, কানাডাতে প্রথমে 'গুছিয়ে বসে' নিয়ে তারপর ঠাকুমাকেও নিয়ে আসবেন, যদি সম্ভব হয়। মাও তো আগে এ-দেশে আসেননি? নিজে দেখেশুনে, ব্যাপারটা বুঝে, তারপর। ঠাকুমা থাকতে পারবেন

কি না, সেটা তো বুঝতে হবে? বাবা তো কিছুই বোঝেন না। কেবলই বলছেন, "মার পক্ষে এ-দেশে বাস করা অসম্ভব!"

কৌশিকীর মায়ের কিন্তু অন্য ধারণা। তাঁর ধারণা, এখানে এসে পড়লে ঠাকুমার মতি-গতি পাল্টে যাবে। ওই যে দাদুভাইয়ের জন্য মনে-মনে কাঁদেন, সেটা অনেকটা কমবে। কৌশিকীর মা ঠাকুমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে চাননি। বাবা জোর করে বললেন, "ওটাই সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত। ডাক্তার, নার্স, সব হাতের কাছে, অসুখ-বিসুখ করলে দেখার লোক আছে। নিজস্ব আলাদা ঘর। অ্যাটাচ্ড বাথরুম, যত খুশি পুজোআচ্চা করো। একটা ছোট্ট কিচেনেট মতো আছে, কিন্তু খাবারদাবার ওরাই সাপ্লাই করে। ডাইনিং রুমেও গিয়ে খেতে পারো, অন্য সবার সঙ্গে মিলেমিশে; আবার একলা ঘরেও খাবার নিতে পারো। ব্যবস্থা খুব ভাল।"

কৌশিকীর তবু কেমন ধারণা হয়েছে ওখানে কেউই তত আনন্দে নেই। বাড়ি বিক্রির থেকে কত টাকা যেন জমা দিতে হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে ঠাকুমার জন্য। অবশ্য বাড়িটাও তো ঠাকুমারই ছিল। ঠাকুমার সই না হলে বিক্রি হত না। বাবা গিয়ে তো সেইসব ব্যবস্থা করেই ওদের নিয়ে এলেন।

রোজ এইরকম সময়ে, যখন সুয্যি ডোবে, ঠাকুমা তখন আবার গিয়ে পুজোর ঘরে ঢোকেন সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে। দিনে তিনবার করে পুজোর ঘরে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে কী করেন ঠাকুমা! অথচ অন্য সময়ে খুব হাসিখুশি। কৌশিকী চলে আসছে বলে যতই মনখারাপ হোক, একবারও মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি ঠাকুমার। একবারও কেঁদে ফেলেননি।

টুকুদিদির মায়ের কাছে গল্প করছিলেন কৌশিকীর মা, "আমার শাশুড়ি খুব শক্ত মানুষ। ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। একমাত্র সন্তান, একমাত্র নাতনি, সবাই দূরে চলে যাচ্ছে, একফোঁটা চোখের জল ফেললেন না!"

টুকুদিদির মা শুনে বললেন, "সত্যি? খুবই আত্মসংযম আছে বলতে হবে। কেননা কষ্ট হচ্ছে না, তা তো হতে পারে না?"

কৌশিকীও জানে সেটা। ঠাকুমার মুখের ভাষাই হচ্ছে, "আমরা মেয়ে, বুঝলি? আমাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। খবর্দার, অত খলবল করে কথা বলবি না! সবাই তোর মনের কথা জেনে গেলে তোরই ক্ষতি!"

কৌশিকী তবুও বেশি কথা বলে ফেলে। ঠাকুমাও খুব কম কথা বলেন বলে তো মনে হয় না, তবে হয়তো মনের কথাগুলো বলেন না। যেমন, এই চলে আসার ব্যাপারে। বিন্দুদিকে নিয়ে একা-একাই বাড়িতে থাকতে চেয়েছিলেন ঠাকুমা। বাবা রাজি হলেন না। ওটা সেফটির প্রশ্ন। একা বাড়িতে বুড়োমানুষ,

দু'জন মেয়ে কীভাবে থাকবেন? আজ না হয় শরীর ভাল আছে। কাল? কাল যদি শরীর খারাপ হয়ে যায়? বিন্দুদির ওপর তো ভার দেওয়া যায় না। ঠাকুমার দাদারা তো আরও বুড়ো। কে দেখবে তাঁকে? সেইজন্যেই—

"কুশি? কী ভাবছিস? ঠাণ্ডা দুধ তো গরম হয়ে গেল।" মায়ের তাড়ায় সংবিৎ ফিরল কৌশিকীর। চোঁ-চোঁ করে খেয়ে ফেলল চকোলেট মিল্কের গেলাস।

ঠাকুমাও খুব চকোলেট খেতে ভালবাসতেন। তারপর কে যেন বলল ঠাট্টা করে চকোলেটে নাকি ডিম থাকে। ব্যস, সেই থেকে বন্ধ। মা কত করে বললেন, "ওতে থাকে না ডিম।" কে শোনে কার কথা!

"কী দেখছ, কৌশিকী? গাছগুলোর কীরকম পাতার রং পাল্টাচ্ছে, তাই দেখছ বুঝি? সত্যি আশ্চর্য লাগে—ঠিক যেন ফুল ফুটেছে। লাল, সোনালি কতরকম রঙের পাতা! না?"

টুকুদিদির মায়ের কথা শুনে কৌশিকী নজর করল, সত্যি তো! সামনের গাছগুলোর সব পাতার রং হলুদ, লাল। মাত্র কয়েকটা সবুজ রঙের পাতা আছে। আর মাটিভর্তি ঝরাপাতার স্তূপ। এতক্ষণ লক্ষ্যই করেনি? তিনদিন হয়ে গেল এসেছে। প্রথম দিনটা তো ঘুম-ঘুমই হয়ে ছিল। এই দু'দিনও ঠিক ফিটফাট হয়নি শরীর, রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না, আর দিনের বেলায় চোখ জড়িয়ে আসছে।

টুকুদিদির মা বললেন, "জেট ল্যাগ! অমন সবার হয়। সময়ের অনেকটা তফাত হয়ে গেছে কিনা? দেশে যখন দিনের বেলা, এখানে তখন রাত্তির। তাই ঠিক সময়ে ঘুম পায় না। ও ঠিক অভ্যেস হয়ে যাবে। প্রথম-প্রথম এমনই লাগবে।"

ঠাকুমা খুব ভোরে ওঠেন বলে কি অনেক সময় যখন-তখন একটু ঘুমিয়ে পড়েন? ওঁরও ওটা কি একরকমের জেট-ল্যাগ? বুড়ো হলে কি সকলেরই ওরকম হয়? কৌশিকীরও হবে? বুড়ো হলে— হঠাৎ কৌশিকীর মনে হয় ঠাকুমারও তো তেরো বছর বয়েস ছিল? আর যখন কৌশিকী বুড়ো হবে?

নদীতে নৌকোরা দ্রুতবেগে জল কেটে চলে যাচ্ছে, পেছনে জলের ওপর জাপানি পাখার মতো রেখা ছড়িয়ে পড়ছে। কৌশিকী দেখল, নদীর ধারে ছুটন্ত মানুষদের ফাঁকে একটি বেঞ্চিতে একজন বসে আছেন। পেছন থেকে কেবল থোপা-থোপা একমাথা সাদা চুল দেখা যাচ্ছে। পরনে কোট। যারা ছুটছে তাদের সকলেরই পরনে গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট। পায়ে মোটা রানিং-শু, মোজা। এঁর মুখটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আশেপাশে পাখিরা উড়ে এসে বসছে। উনি মুঠো করে পকেট থেকে কী যেন নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। পাখিরা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তাঁর পাশেই একটা মোটা সাদা ঝুমরো-ঝুমরো চুলে ঢাকা কুকুরও বসে আছে একেবারে

বেঞ্চির ওপরে উঠে! কী গম্ভীর! পাখিদের কিচ্ছু বলছে না। পাখিরাও কই, কুকুরটাকে ভয় পাচ্ছে না তো?

ইনি একজন বুড়ো মানুষ। ইনি বেড়াতেই বেরিয়েছেন। ব্যায়াম করতে নয়। ছুটতে নয়। তা হলে এ-দেশে এখনও কিছু-কিছু লোকে বেড়াতে বের হয়? কেউ-কেউ পাখিদের কথা ভাবে? ঠাকুমা দুপুরে রোজ খাবার পরে ছাদে গিয়ে কাকেদের একমুঠো ভাত দিতেন, উঃ কত কাক আসত তখন ছাদে! সেই কাকগুলো এখন কী করে? ঠাকুমা কি বৃদ্ধাশ্রমেও কাকেদের ভাত খাওয়াবেন? কাকেদের ভাত খাওয়ানো ওরা অ্যালাউ করবে তো?

কৌশিকী নিজেই কখনও বোর্ডিংয়ে থাকেনি, ঠাকুমা তো ননই। ঠাকুমার নাকি সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, এখন ঊনসত্তর। এতদিন ধরে, সারাজীবন ধরে যে বাড়িটাতে ছিলেন সেটাকে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধদের বোর্ডিংয়ে চলে যেতে তাঁর নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি। কিন্তু ঠাকুমা কিছুই বলেননি। বাবা যা করেছেন সেটাই মেনে নিয়েছেন। বাবাকে যদি কৌশিকী একদিন বৃদ্ধদের আশ্রমে রেখে দিয়ে ভেনেজুয়েলায় চলে যায়?

"চপটা ভাল হয়েছে, কৌশিকী?"

"খুব ভাল। ডালমুটটাও খুব ভাল হয়েছে।"

"আর-একটু চকোলেট মিল্ক খাবে? আইসক্রিম ভাসিয়ে দিয়ে?" টুকুদিদির মা লোভ দেখান। —"দুধ না। শুধু শুধু আইসক্রিম খেতে পারি।" কৌশিকীও চালাক মেয়ে।

চা খেতে-খেতেই টুকুদিদির মা বলেন, "চলো কৌশিকী, তোমার বাবা আসার আগেই তোমাকে আমার বন্ধু রুথের বাড়িতে নিয়ে যাই। রুথ বাচ্চাদের জন্য অনেক বই লিখেছে।"

কৌশিকীর কাছে এই প্রস্তাব খুব মনের মতো লাগল, বাচ্চাদের জন্য বই লেখেন এমন লোকের সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয় ভাল লাগবে।

"যাবে, মা?" কৌশিকীর প্রশ্নে মা এত চটপট ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন যে, মারও বেশ উৎসাহ আছে বলে বোঝা গেল। —বাব্বাঃ! পাশের বাড়িতে যাব একটু বেড়াতে, তার জন্যও আগে থেকে ফোন করা চাই। টুকুদিদির মা রুথের কাছে ফোনে জেনে নিলেন তাঁর অসুবিধে আছে কিনা। এ-দেশে নাকি এটাই নিয়ম। কেউ দুম করে চলে যায় না কারও বাড়িতে! আগে অনুমতি নিতে হয়। আর কলকাতায়? দিনরাত্তির কত লোক আসছে! কেউ কখনও অনুমতি নিয়ে আসে না। মা-বাবার কত সময়ে তো রীতিমত অসুবিধে হয়! তবু কাউকে কিছু

বলেন না।

ঘণ্টি টিপতেই রুথ বেরিয়ে এলেন। লাল চুল, চোখে চশমা, পরনে গেঞ্জি আর ব্লু জিন্‌স। ছোট-ছোট চুল। ছেলে, না মেয়ে হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না, তবে হ্যাঁ, ঠোঁটে লিপস্টিক আছে। "হাই, শমিতা! কাম অন্ ইন!" রুথ ওদের হাসিমুখে ভেতরে নিয়ে গেলেন। যেতে-যেতেই বললেন, "আর বোলো না। আমার মা এসেছেন!" কথাটায় রাজ্যের বিরক্তি যেন ঝরে পড়ল। "কিছু মনে কোরো না, যদি উনি তোমাদের বোর করেন। আমাকে তো পাগল করে দিচ্ছেন।"

কেউ যে নিজের মায়ের সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে পারে, কৌশিকী তা ভাবতে পারে না। সে থ' হয়ে গেল। মার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, মা কী মনে করছেন। বোঝা গেল না কিছু। মায়ের মুখে হাসি-হাসি সেই ভদ্রতার মুখোশটা এঁটে আছে। যার পেছনে কী হচ্ছে, তা বোঝা কৌশিকীর পক্ষেও সহজ নয়।

রুথের বসার ঘরে এক বৃদ্ধা মহিলা বসে উল বুনছেন। কৌশিকীদের দেখেই বললেন, "ও, এরাই বুঝি তোমার সেই ইন্ডিয়ান প্রতিবেশী, রুথ? এসো, এসো।"

রুথ বললেন, "আঃ, মা। একটু ধৈর্য ধরো। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, এই আমার মা। ফ্লোরিডাতে থাকতেন। এখন আমাদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছি।"

টুকুদিদির মা বললেন, "আমি শমিতা, এ হল আমার বন্ধু রূপশ্রী, আর এ তার মেয়ে কৌশিকী।"

রুথের মা বললেন, "আমার তো একটাও নাম মনে থাকবে না, অচেনা নাম আমার মনে থাকে না। আর তোমাদের নামগুলো বড্ড কঠিন।"

রুথ অমনই ধমকে উঠলেন, "ওদের নাম কঠিন? না, তোমার স্মৃতি চুলোয় গেছে? এ হচ্ছে শমিতা, আর এ হল, ...কী যেন বললে? রূপ—রূপ—...."

"রূপা বললেই হবে।" কৌশিকীর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আর এর নাম কুশি।"

মা'র দিকে চেয়ে রুথ খিঁচিয়ে ওঠেন, "রূপা, কুশি। শক্ত নাম কোথায়? তোমার তো সবই অচেনা ঠেকে। আগে ভাল করে শোনো?"

ওঁর মা এবার খুব অবাক সুরে বললেন, "রূপা? কুশি? আমি যেন শুনলাম অনেক লম্বা-লম্বা নাম বলছ। সত্যি, কী শুনতে যে কী শুনি আজকাল!"

কৌশিকীর ভীষণ মায়া হল। সে তাড়াতাড়ি বলল, "ঠিকই শুনেছিলেন। লম্বা-লম্বা নামই তো প্রথমে বলেছিলেন মাসি। মায়ের নাম হল রূ—প—শ্রী।

মার ছোট নাম : রূপা। আর আমি কৌ—শি—কী। আমার ছোট নাম : কুশি।''
হাসতে-হাসতে শমিতামাসি বললেন, ''আমরা বাঙালি তো? আমাদের দুটো করে নাম থাকে। একটা শক্ত, একটা সোজা।''

এবার রুথের মা হেসে উঠলেন, ''দেখলে তো? আমি ঠিকই বলেছিলাম। প্রথমে শক্ত নামটা বলেছিল, পরে সোজা নামটা বলেছে। তাই না?''

রুথ আবার ধমক দিলেন তাঁর মাকে, ''তুমি তোমার নিজের কাজ করো। ওদের নাম নিয়ে অত রিসার্চ করে কাজ নেই তোমার।''

কৌশিকী হতবাক! এ কেমন মেয়ে রে বাবা! এইভাবে কেউ মায়ের সঙ্গে কথা বলে?

মা কি দিদিমার সঙ্গে কখনও এভাবে কথা বলবেন? ''চলো, আমরা বরং ও-ঘরে যাই। এ-ঘরে থাকলেই মা কথা বলবেন।''

এবার শমিতামাসিও অবাক হয়ে রুথকে বললেন, ''তাতে কী হয়েছে? বলুন না? ভালই তো!''

''বুড়ো হয়ে বকবক করা স্বভাব হয়েছে মায়ের। ওইজন্যই তো মোটে পছন্দ নয় ওঁর এই বয়স্ক-কলোনিটা। সেখানে যে যার নিজের মতো থাকে, মার তাতে খুবই আপত্তি। মোটে পছন্দ নয়।''

''পছন্দ তো নয়ই। আমি কী সুন্দর ফ্লোরিডার খোলামেলা উষ্ণ আবহাওয়ায় কুড়ি বছর কাটিয়েছি, সবার সঙ্গে সবার ভাব আছে সেখানে। তোমার বাবা মারা যাওয়ার পরেও আমি ফ্লোরিডাতেই থাকতে চেয়েছিলাম প্রতিবেশীদের মধ্যে, তুমিই—''

''আমার পক্ষে সম্ভব হয় না ফ্লোরিডাতে দৌড়ে-দৌড়ে তোমার দেখাশোনা করা। এখানে থাকলে সেটা সম্ভব। আর যে-কলোনিতে তোমাকে রেখেছি, সেটা শ্রেষ্ঠ কলোনিগুলোর মধ্যে একটা।''

''অত টাকা দিলে শ্রেষ্ঠ হওয়াই উচিত। ফ্লোরিডার বাড়ি বিক্রি করে টাকা তো কম পাওনি, আমি আর ক'টা দিনই বা, নব্বই চলছে আমার।''

''আমারও বাষট্টি হয়েছে ভুলো না, আমিও দিদিমা,'' রুথের কথা শুনে কৌশিকী অবাক! বাষট্টি? দিদিমা? ও তো ভেবেছিল মারই বয়সী হবেন রুথ। নাঃ, এ বড় অদ্ভুত দেশ! কারও বয়েস বোঝা যায় না।

রুথের মা ঠিক ওর দিদিমা-ঠাকুমার মতো, কিন্তু রুথ ওর মা-মাসিদের মতো নয়। রুথ চেনা কারও মতোই নয়। হঠাৎ কৌশিকীর মনে হল, হুঁ রুথ, না রুথলেস! তবে কি 'রুথ' মানে দয়া? করুণা? মায়া-মমতা? কী জানি?

রুথের মা চুপ করে আছেন দেখে শমিতামাসি কথা ঘোরালেন, ‘‘ওটা কী বুনছেন? সোয়েটার?’’

তিনি বললেন, ‘‘না, এটা একটা স্টোল বুনছি।’’ ‘‘কার জন্য বুনছেন? ভারী সুন্দর হচ্ছে।’’

‘‘থ্যাঙ্কিউ, দেখি কাকে দিই?’’ বলে মিষ্টি হাসেন রুথের মা, রুথের দিকে তাকিয়ে।

‘‘সম্ভবত তাঁর আহ্লাদি নাতনির জন্য।’’ রুথ বলেন, প্রায় মুখ ভেঙচে।

‘‘আবার কাকে দেব, তোমার মেয়েকে ছাড়া? সত্যি, রুথের মেয়েটা আমাকে খুব ভালবাসে। ছবি পাঠায় কত।’’

‘‘জন্মে তো দেখা করতে যায় না একদিনও।’’

‘‘এই তো গিয়েছিল, হলিডে হোমে।’’

‘‘সে কেপকডে বেড়াতে যাওয়ার জন্য যাওয়া, তোমাকে দেখার জন্য গিয়েছিল ভেবো না।’’

এবার রুথের মা চুপ করে থাকেন। দুঃখিত দেখায় তাঁকে, এ কীরকম কথাবার্তা? কৌশিকী অবাক হয়ে ভাবে। কেবল বুড়ো মাকে কষ্ট দিয়ে কথা বলছে। ব্যাপার কী? ওরই মেয়েকে যদি উনি ভালবাসেন, তাতে তো রুথেরও খুশি ই হওয়া উচিত, হিংসে-হিংসে শোনাচ্ছে কেন কথাগুলো? আবার মায়ের মুখের দিকে তাকাল কৌশিকী। মা মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন।

এই নিষ্ঠুর মহিলা বাচ্চাদের জন্য লেখেন? বুড়োদের যে কষ্ট দেয়, বাচ্চাদের সে ভালবাসবে কেমন করে? নিজের মাকে, নিজের মেয়েকে যে ভালবাসে না, অন্যের ছেলেমেয়েকে সে আনন্দ দেবে? আর এই দেশেই থাকবে কৌশিকী আর তার বাবা-মা?

সামনে একটা ছবির অ্যালবাম ছিল। অন্য কথা ভাবতে-ভাবতে কৌশিকী কখন সেটা হাতে তুলে নিয়েছে।

রুথের মা বললেন, ‘‘এটা আমাকে আমার নাতনি দিয়েছে। দ্যাখো, দ্যাখো, ওর নিজের সব ছবি, ওর কলেজের ছবি, ক্যাম্পিং-এর ছবি, বয়ফ্রেন্ডের ছবি, আমি ফ্লোরিডায় থাকতাম তো? তাই আমাকে সবসময়ে ও ছবি পাঠাত, সব খবর জানাত, প্রতি হপ্তায় টেলিফোন করত,—এখনও করে।’’ তাঁর গলার স্বরই পাল্টে গেছে।

কৌশিকী চোখ তুলে দেখল, নাতনির কথা বলতে গিয়ে তাঁর মুখ জ্বলজ্বল করছে আনন্দে। হ্যাঁ, কৌশিকী ঠিক বুঝতে পেরেছে রুথ যাই বলুন। ‘‘কী সুন্দর

অ্যালবাম, ওর জীবনের সব খবর আছে এতে, আমার জন্য তৈরি। এই ওর হাই স্কুল, গ্র্যাজুয়েশনের ছবি। আর এটা কলেজের। তোমাকে আরও একটা জিনিস দেখাই,'' ফিসফিস করে উনি বললেন। তারপর ওপাশের টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা লাল খাতা বের করে দেখালেন, ''আর এইটে দিয়েছে। যখন আমার ওকে কিছু বলতে ইচ্ছে করবে, এই খাতাতে লিখে রাখতে বলেছে। ও যখন আমার কাছে আসবে, তখন যাতে একটাও মনের কথা হারিয়ে না যায়। কত ভালবাসে আমাকে, তাই না?''

কৌশিকী রুথের মায়ের চোখের দিকে চেয়ে বলল, ''হ্যাঁ।''

রুথ বলেছিলেন, ''মা বড্ড বকবক করেন,'' আর নাতনি বলে, ''দিদিমার একটাও মনের কথা যেন হারিয়ে না যায়।'' কিছুই না বুঝে রুথ লেখেন কী করে?

''বাড়ি ফিরতে হবে এবারে,'' মা হঠাৎ কৌশিকীর মনের কথাটা বলে ওঠেন।

''সে কী? একটু শরবত খেয়ে যাও?'' কিন্তু ওরা ফেরত রওনা হয়। বাবা, মেসোমশাই এতক্ষণে ফিরেছেন।

ফিরতে ফিরতেই কৌশিকী বলে ফেলে, ''এই রুথ তোমার বন্ধু? নিজের মায়ের সঙ্গে কথা বলতে জানেন না। মাকেও ভালবাসেন না, মেয়েকেও ভালবাসেন না, কী করে লেখেন উনি ছোটদের জন্য? কী অদ্ভুত ব্যবহার!''

আস্তে গলায় শমিতামাসি বলেন, ''এটা তেমন খারাপ ব্যবহার হল কোথায়? রুথ তো অনেকের চেয়ে ভাল। সামারে মাকে কেপকডের হলিডে হোমে রেখেছিল, শীত আসছে বলে খুব তোড়জোড় করে গরম জামাটামা গুছিয়ে দিচ্ছে, ওর মায়ের অবশ্য ধারণা এই শীতের দেশে এসে উনি আর বাঁচবেন না। লোকেরা বুড়ো হয়ে ফ্লোরিডায় গিয়েই রিডায়ার্ড জীবন যাপন করে। উনি বিধবা হয়ে নব্বই বছর বয়েসে আবার নতুন করে এখানে এসে পড়লেন, ফ্লোরিডা থেকে। রুথ মাকে দেখতে যায় প্রায়ই, খাবারদাবার তৈরি করেও নিয়ে যায়; ওর ব্যবহার আসলে খুব খারাপ নয়। অন্যরা তো বাবা-মাকে সেই যে ওল্ড-এজ হোমে ফেলে দিয়ে চলে আসে, আর সে-মুখো হয় না। মাঝে-মাঝে কার্ড পাঠায়। ফুল পাঠায় জন্মদিনে, ক্রিসমাসে চকোলেট। আর মাদার্স ডে, ফাদার্স ডে-তে গ্রিটিং কার্ড। এই তো। গ্রীষ্মে হলিডে হোমে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা মানেই সেই বুড়ো-বুড়িকে খুব যত্নআত্তি করা হচ্ছে। বুঝলে? এ বড় কঠিন জায়গা, এদের হিসেবগুলোই অন্যরকম।''

হঠাৎ কৌশিকীর মনে হল, এমন কী আর অন্যরকম? ঠাকুমা এখন বৃদ্ধাশ্রমে।

এমন কিছু আলাদা নয় তো? বাবা-মা আর কতবারই বা কানাডা থেকে দেখতে যাবেন ঠাকুমাকে? ওই তো চিঠিই লিখবেন। ফুল নয়? চকোলেট নয়, শুধু চিঠি। পিকচার পোস্ট কার্ড। একদিন তার ঠাকুমাও বলবেন অচেনা লোকদের ডেকে, "আমার নাতনি সত্যি আমাকে খুব ভালবাসে। দ্যাখো, কত ছবি পাঠিয়েছে।"

গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠল কৌশিকীর। ইচ্ছে করল, একছুটে দেশে ফিরে যায়। কৌশিকী থাকবে না। যেই বড় হয়ে যাবে, একা-একা বাঁচতে পারার মতো বড়ো, তক্ষুনি দেশে ফিরে যাবে কৌশিকী। ঠাকুমাকে নিয়ে নিজে নিজে একটা বাড়িতে থাকবে।

সামনে তাকিয়ে কৌশিকী দেখল নৌকো যাচ্ছে। এটা একটা স্টিমার। তার আলোর সারির ছায়া পড়েছে নদীর কাঁপা জলে। কৌশিকীর মনে হল, এই যে তারা এখন টুকুদিদিদের বাড়িতে এসে আছে, এটা একটা স্টিমার। কলকাতায় ওরা যে বাড়িতে থাকত, সেটা ছিল একটা রো-বোট। সেখানে দাদুভাই, ঠাকুমা, বাবা, মা, কৌশিকী, বিন্দুদি,—ছ'জন। তারপর? এখন? এখন কৌশিকী, মা, বাবা কানাডাতে তিনজনে থাকবে, একটা ক্যানো। আর ঠাকুমা একলা, একটা কায়াক।

কৌশিকীর চোখে ভেসে উঠল, খুব দ্রুতগতি একটা পাহাড়ি নদী, পাথুরে নদী, যেরকম দেখেছে ও সিনেমায় অনেকবার, খুব জোরে জোরে তাতে দু'হাতে দাঁড় বেয়ে কায়াক চালিয়ে একা-একা ঠাকুমা স্রোত বেয়ে চলে যাচ্ছেন, দূরে।

প্রকাশকাল : ১৪০১ বঙ্গাব্দ

রঞ্জনের গল্প

কিছুতেই অঙ্কটা মাথায় ঢোকে না রঞ্জনের। প্রতিদিন মাস্টারমশাই মার লাগান, বেতের ছপটি রঞ্জনের পিঠে ছড়া-ছড়া দাগ ফুটে ওঠে, অথচ মাথার মধ্যে অঙ্কটা ফুটে ওঠে না। অঙ্কের জন্য ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে ওঠাই হল না। দু'বার ফেল করে রঞ্জন পালিয়ে গেল কলকাতায়, বড়দার কাছে। বড়দা ওখানে কলেজে পড়ছে ব্যানার্জীবাবুদের বাড়িতে থেকে। বড়দা তো রঞ্জনকে দেখে অবাক! "ফেল করেছিস? আবার?"

দাদার মাথায় অঙ্কটা ভাল খেলে। দাদা সায়েন্স পড়ছে। গাঁয়ের কলেজে সায়েন্স নেই। প্রচণ্ড বকুনি দিয়ে রঞ্জনকে দাদা বাড়িতে ফেরত নিয়ে এল ঠিক দু'দিনের মধ্যে। বাড়িতে এসে, আবার বকুনি।

বাবা বললেন, "কুলাঙ্গার! দু'বার ফেল করা? তাও একই ক্লাসে?" মেজদাও স্কুল ফাইনাল পাশ করে যাবে এ-বছর। টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করেছে। লক্ষ্মীকান্তপুরে রঞ্জনদের বাড়িটা একটা মাঠের মধ্যে, বাবার অনেক জমিজমা আছে, একটা বিশ বিঘের পুকুর আছে, তাতে মাছের চাষ হয়। বাবার খুব শখ, পাঁচ ছেলেকে পঞ্চপাণ্ডবের মতো তৈরি করবেন। পড়াশোনায় ঝকমক, গাঁয়ের সব্বার চেয়ে ভাল করবে। বাবার নিজের খুব বেশি দূর পড়া হয়নি, কিন্তু কাকাকে পড়িয়েছিলেন। কাকা চলে গেছেন বি-এ পাশ করার পরেই, গ্রামের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, গ্রামের গৌরব বোম্বাই চলে গেছেন কী জানি কী চাকরি নিয়ে। প্রথম-প্রথম টাকা পাঠাতেন, ঠাকুমা মারা যাওয়ার আগেই টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ বলে বোম্বেতে কাকার রমরমা ব্যবসা, কেউ বলে কাকা ফিল্মে

SHAMIANA
BURGER
KINGS

কাজ করেন, কেউ বলে অন্য কিছু করেন। যাই করুন, রঞ্জনদের কোনও খোঁজখবর রাখেন না। কেউ মুখ ফুটে না বললে রঞ্জনের বাড়িতে অন্য একটা ধারণা আছে যে, কাকা সম্ভবত অন্যায় করে জেলে গেছেন। তাই চুপচাপ।

বাবা রঞ্জনকে স্কুলে ফেরত পাঠাবেনই, আর রঞ্জন কিছুতেই যাবে না, এই ঘটনা যখন চরমে উঠল, রঞ্জনের মা তখন যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। মা বললেন, "তুমি তো ভাইকে লেখাপড়া করালে। আরও চারটে তো ছেলে আছে তোমার? তাদের তুমি লেখাপড়া শেখাও। এইটে মাঝখানের ছেলে, দুটো বড়, দুটো ছোটোর ঠিক মধ্যিখানে। এটাকে আমায় দাও, একে আমি আমার শিক্ষাটাই শেখাই। তারপরে এ যা রোজগার করবে, আমাকে এনে দেবে। তোমার চার ছেলের রোজগার তুমি নিয়ো। এটা কেমন ব্যবস্থা?"

বাবার পছন্দ হল না বটে ব্যবস্থাটা, কিন্তু আপত্তিও করলেন না। তিনি চাষবাস, জমিজমা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর খুব শখ ছেলেরা ডাক্তার হবে, উকিল হবে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে। চাষী বাবার চাষী স্ত্রী রঞ্জনের মা, কী আর শিক্ষা তিনি দিতে পারতেন তাঁর ছেলেকে? কিন্তু রঞ্জন খুব একগুঁয়ে ছেলে, সে শুনবে না কথা। বাবা মনে মনে জানেন ওই স্কুলে ওকে ফেরত পাঠানো অসাধ্য। নিজের গ্রামের স্কুলে না পাঠিয়ে, অন্য কোথাও, দূরের গ্রামের স্কুলে পাঠানোর চেষ্টাও বাবা করেছিলেন, রঞ্জন সেখানেও যাবে না। মা বললেন, "আমার একটাও মেয়ে নেই। রঞ্জনকে আমায় দাও, আমি ওকে আমি যা জানি, তাই শেখাই। তোমার বাকি চার ছেলেকে তুমি তোমার মতন করে তৈরি করো।"

রঞ্জন তো মহাখুশি। মায়ের সঙ্গে সে শিখতে লাগল বড়ি দিতে, পাঁপড় তৈরি করতে, আচার বানাতে, আস্তে আস্তে ভাতের মাড় গালতে, দুধ জ্বাল দিতে, গুড় জ্বাল দিতে। মা আস্তে আস্তে রঞ্জনকে রান্না শেখাতে লাগলেন। তারপর বললেন, "গাঁয়ের রান্না তো সবই শিখিয়ে দিয়েছি তোকে, পিঠেপুলি, ঝোলঝাল, টক-অম্বল, চচ্চড়ি, শুক্তো—সব শেখা হল, এবার শহরের রান্না শিখতে হবে তোকে। দাদার কাছে ব্যানার্জীবাবুদের বাড়িতে যা।"

দাদা তখনও ব্যানার্জীবাবুদের ওখানে। গ্রামের ডাক্তারির জন্য কী একটা কোর্স পড়ছিল, Barefoot Doctors না কী যেন বলে, পুরোপুরি ডাক্তারি নয়, কিন্তু মোটামুটি কাজ চালানোর মতো। ব্যানার্জীবাবুরা স্বামী-স্ত্রী একা থাকেন, মেয়ের বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। রঞ্জনের দাদা তারাপদকে খুব ভালবাসেন। রঞ্জনকে আনান্দর সঙ্গেই ঠাঁই দিলেন বাড়িতে। গিন্নিমা খুব যত্ন

করে রান্না শেখাতে শুরু করে দিলেন রঞ্জনকে। রঞ্জনও তাঁকে গাঁয়ের রান্নাবান্না কিছু রেঁধেবেড়ে খাওয়ায়, আর মা ওকে শেখান পোলাও-কালিয়া, চপ-কাটলেট, সুপ-পুডিং, শিঙাড়া-কচুরি। বেশিদিন লাগল না, রঞ্জন এক্সপার্ট রাঁধুনি হয়ে গেল। মা আর রান্নাবান্না করেন না, রঞ্জনই রাঁধে। ওঁরা ওকে হাতখরচ যেটা দেন, রঞ্জন সবটা মায়ের হাতে দিয়ে আসে; সেরকমই কথা ছিল। চার ছেলে যা রোজগার করবে, বাবাকে দেবে। বাবা তাদের পড়াশোনার খরচ জোগাচ্ছেন। আর রঞ্জন যা রোজগার করবে, তা হবে মায়ের সম্পত্তি।

এরকমই চলছিল। হঠাৎ একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ব্যানার্জীবাবুর জামাইটি চলে যাচ্ছে সানফ্রান্সিস্কোতে, চাকরি নিয়ে। মস্ত বড় চাকরি, সঙ্গে বউ যাচ্ছে, বাচ্চা যাচ্ছে। তারা নাকি একজন রান্নার লোকও নিতে পারে। লোকের জন্য খোঁজখবর করছে। রঞ্জন গিন্নিমাকে বলল, "মা, আমি যাই? আপনার অসুবিধে হবে কি?"

মা বললেন, "তুই গেলে তো আমি সবচেয়ে নিশ্চিন্ত হই রে রঞ্জন, আমার মেয়েটা বাচ্চা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, সেও তো নতুন জায়গায় গেছে, ওর কাছে তুই থাকলে আমার মনে কত আরাম হবে।"

আর দ্বিতীয় কথা নয়, রঞ্জন নাচতে নাচতে দেশে এসে মাকে বলল, " মা আমি আমেরিকায় যাচ্ছি।"

মা বললেন, "পাগল? আমার ছেলেকে আমি মোটেই ওসব বিলেত-আমেরিকায় যেতে দেব না।"

বাবা বললেন, "খেপেছিস? ওখানে নিয়ে ফেলে তারপর যদি তোকে টাকাকড়ি না দেয়? না পারবি পালিয়ে আসতে, না পারবি টিকে থাকতে। খবরদার, যাবি না।"

দাদা বলল, "একবর্ণ ইংরিজি জানিস না, তুই যাবি কিনা আমেরিকা? হুঁঃ!"

মেজদা বলল, "রান্না করতে আমেরিকা যাচ্ছিস? বাঃ! কেন, এদেশে বুঝি রান্নাঘর ছিল না?"

ছোট ভাই দুটো স্কুলে পড়ছে, ওরা ম্যাপ এনে বসে গেল সানফ্রান্সিসকো কোথায়, বের করতে। "বাব্বাঃ, অনে-ক দূরে রে সেজদা, লন্ডন-টন্ডনের থেকে আরও অনে-ক দূরে। এখানে যখন দিন, ওখানে তখন রাত্তির হওয়ার কথা।"

"ওখানে নিশ্চয় ভীষণ শীত করবে রে সেজদা, বরফ পড়ে শুনেছি আমেরিকাতে।"

"সানফ্রান্সিসকো শহরটা তো ক্যালিফোর্নিয়াতে। ওইখানেই হলিউড, যেখানে

সব সিনেমা তৈরি হয়। তুই পথেঘাটে কেবল সব ফিল্মের নায়ক-নায়িকাদের দেখতে পাবি। দেখে চিনতে পারবি?''

''কী করে পারব? আমি কি ইংরিজি ছবি দেখি, না ইংরিজি বুঝি?'' রঞ্জনের উত্তরে একদম খুশি হল না ছোট ভাইরা। তারাও অবশ্য ইংরিজি সিনেমা দ্যাখে না। ওই সিনেমার পত্রপত্রিকা থেকে হলিউড আর ক্যালিফোর্নিয়ার কথা জেনেছে মাত্র। ওদের খুব উৎসাহ যে সেজদা আমেরিকাতে যায়। কলকাতাতে সাত বছর হয়ে গেছে, মেজদারও বিয়ে হয়ে গেছে। রঞ্জনের এবার বিয়ে হওয়ার কথা। রঞ্জনের পরের ভাই হায়ার সেকেন্ডারি ইলেভেন ক্লাসে পড়ছে, আর ছোটটা ক্লাস এইটে। রঞ্জনের বিয়ের কথা নিয়ে মা-বাবা আজকাল খুব আলোচনা করেন। দাদা, মেজদা দুজনেরই বাচ্চাকাচ্চা হয়ে গেছে। দাদার ডাক্তারি কাজ জোটেনি, সে অন্য কোনও কাজ করতেও রাজি হয়নি। কাজের আশায় ঘরে বসে বাবার অন্ন ধ্বংস করছে। মেজদা মুদির দোকানে খাতা লিখে দিনে কুড়ি টাকা করে পায়। কিন্তু মাত্র হপ্তায় তিনদিন কাজ। রঞ্জনই মাকে মাস গেলে চারশো টাকা এনে দেয়। বাবার চাষবাস, মাছের ব্যবসাতেই এখনও সংসারের মূল আয়। মা সেটা মাঝে-মাঝেই বলতে ছাড়েন না, ''তোমার ভাইকে লেখাপড়া শেখালে, সে তো কত দেখল তোমার মা-বাপকে। তোমার ছেলেদের লেখাপড়া শেখালে, দেখা যাক শেষপর্যন্ত ছেলেরা বাপকে দেখে, না বাপকেই ছেলেদের দেখতে হবে! আমার মুখ্যু মায়ের মুখ্যু ছেলে হাতের কাজ শিখে মাস গেলে হাতে কিছু এনে দিচ্ছে।''

আমেরিকায় গেলে, মাসে দেড় হাজার টাকা মাইনে পাবে রঞ্জন। মাইনে ওই জামাইবাবুর কোম্পানিই দেবে। দিদি, জামাইবাবু খুব ভালোমানুষ। রঞ্জনকে খুবই স্নেহ করেন, আর বাচ্চা মেয়েটা, সোনা, তো 'জন্‌জন্‌দাদা' বলতে অজ্ঞান। ওদের কাছে থাকতে ভালই লাগবে রঞ্জনের। রঞ্জন যাওয়ার জন্য তৈরি। কিন্তু বাবা-মা কিছুতেই মত দিচ্ছেন না। দিদি, জামাইবাবু, সোনাকে চলে যেতে হল। রঞ্জনের ভিসা, টিকিট সব কোম্পানি করে দেবে। প্লেনে তুলে দেবে, কেবল মতামতের অপেক্ষা। ঠাকুমা বললেন, ''কবে ফিরবি, কে জানে, ততদিন আমি বাঁচব কি না। দেখা হবে কি না। আমেরিকা কি বোম্বাইয়ের চেয়েও দূরে?''

বাবা বললেন, ''পাঁচ ভাই একসঙ্গে থাকো আমি চাই, ওই বিদেশ-বিভুঁইয়ের চাকরির লোভ ভাল নয়।'' বাবার মনেও কাকার বোম্বাই চলে যাওয়ার দুর্ভাবনা আছে। মা বললেন, ''যাবে তো যাও, কিন্তু বিয়ে করে যাও। আমি বরং মেয়ে দেখি। অতবড় ছেলেকে বিয়ে না দিয়ে কেউ বিলেতে পাঠায় না। ও-দেশের সব

মেমেদের নাকি ঠিক কামিখ্যের মতন তুকতাক জানা আছে।”

রঞ্জন হেসে ফেলল এতক্ষণে। “মাগো, মেমেরাও আমাদের মেয়েদের মতনই। তারা কি ডাইনি? তাদেরও তো ঘরসংসার আছে, স্বামীপুত্তুর আছে? তোমার ছেলের দিকে তাদের নজর না দিলেও চলবে।”

“কেন, আমার ছেলে কি ফ্যালনা?” মা সগর্বে রঞ্জনের দিকে তাকান। কালো কুচকুচে রং, কিন্তু ভারী সুশ্রী। রঞ্জনের মুখের মধ্যে একটা মিষ্টি কোমল বাঙালিয়ানা আছে, আর দুটো বড়-বড় চোখে বুদ্ধি ঝকঝক করছে। কেন যে অঙ্ক ঢুকত না ওর মাথায়, তা ওর মা এখনও বুঝতে পারেন না।

রঞ্জন বলল, “মা, বিয়ে করে যাওয়া হবে না। আমি তিন বছরের জন্যে যাচ্ছি, জামাইবাবুর তিন বছরের চাকরি। ফিরে এসে বিয়ে করব।”

“এখন বউ ছেড়ে যেতে মন চাইবে কেন?” বড়বৌদি ফোড়ন কাটল।

রঞ্জন বলল, “সত্যিই তো!”

বাবা বললেন, “না বাবা, যদি আর দেখা না হয়? এরোপ্লেনে করে যেতে হবে। যদি পথে পড়ে-টড়ে যায়? এরোপ্লেনের ব্যাপার। না, আমার মত নেই।”

রঞ্জন বলল, “দেখুন বাবা, যদি মরেও যাই, যাব। একদিন তো মরতে হবেই, তবু প্লেনে তো চড়া হবে। এমনিতে লোকে কত চেষ্টা করে আমেরিকা যায়। কত পড়ালেখাতে ভাল হতে হয়, তবে স্কলারশিপ জোটে, তবেই লোকে যায়। আমার বিনা-চেষ্টাতেই জুটে গেছে সুযোগ। আমি ছাড়ব না। আপনারা যে যাই বলুন, আমি যাবই। মরলে মরব, কিন্তু প্লেনে চড়ে মরব।”

রঞ্জন আমেরিকাতে যাচ্ছে। এতবড় খবর, গ্রামে-গ্রামে রটে গেছে। অন্য-অন্য গ্রাম থেকে লোকেরা এসে রঞ্জনের মা-বাপকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগ লোকই বলছে, “এই ছেলে তোমার জন্মের শোধ চলে গেল। বোম্বাই গিয়েই ভাইটা ফেরেনি। বিলেত-আমেরিকায় গেলে কেউই ফেরে না। সেখানে কত আরাম। কত সুখ। আর কত টাকা। তার ওপর মেমসায়েবদের কত ছলাকলা। তোমাদের অতটুকুনি ছেলে, এখনও চব্বিশ হয়নি, ওকে ইচ্ছে করে টাকার লোভে জলাঞ্জলি দিলে? বিসর্জন দিলে? বাপ হয়ে ছেলেকে আটকাতে পারলে না।”

বাবা রেগে যাচ্ছেন, কিন্তু কিছুই বলছেন না। মা কেবলই কাঁদছেন। ঠাকুমা কেবল জপ করছেন, আর মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছেন, “ঠাকুর সব ভাল করবে! তোরা চুক্করতো? যত্ত হিংসের কথা! তোদের ছেলেরা আমেরিকা যেতে পায়নি কিনা? তাই—”

জামাইবাবুর আপিস থেকে সব তৈরি হয়ে গেল। রঞ্জনের পাশপোর্ট, ভিসা, এরোপ্লেনের টিকিট, সুটকেস, পোশাকপত্তর, জুতো পর্যন্ত। একজন মারোয়াড়ি ভদ্রলোক, 'পূর্ণ' সিনেমার পাশে থাকেন, তিনি যাচ্ছেন টোকিও পর্যন্ত, তিনি রঞ্জনের দেখাশোনা করবেন টোকিও অবধি। তারপর সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত রঞ্জন একলা।

সানফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টে অবশ্য দিদি-জামাইবাবু থাকবেন।

দমদমে রঞ্জনকে তুলে দিতে শুধু তার চার ভাই গেল না,গাঁসুদ্ধু অল্পবয়সী প্রায় সকলেই এসে হাজির হল। এয়ারপোর্ট কেমন, তা কেউ দেখেনি, এরোপ্লেনই দেখেনি কেউ। মা গেলেন, পিসিমা গেলেন, ঠাকুমা পর্যন্ত এলেন। কেবল বাবা এলেন না। বাবার অমতটা বাবা শেষ পর্যন্ত জানান দিলেন এইভাবে।

কোট, প্যান্ট, জুতো, মোজা পরে রঞ্জনকে দেখাচ্ছিলও চমৎকার। রঞ্জনকে তুলে দিতে যতজন লোক এসেছিল, জামাইবাবুর অফিসের বাবুরা হাসাহাসি করে বলল, "এ যে দেখি ভি আই পি-র মতো অবস্থা!" সত্যিই প্রায় সেই কাণ্ড। গোটা লক্ষ্মীকান্তপুর অঞ্চলের কেউ আগে আমেরিকা গেছে বলে জানা নেই, রঞ্জনের যাত্রা দেখতে, ওকে রওনা করাতে, শত্রুমিত্র যে যেখানে ছিল, সকলেই ছুটেছে দমদম পর্যন্ত। "কপাল করেছিল বটে রঞ্জন!" বলতে বাধ্য হল গ্রামের লোকেরা। হ্যাঁ, উড়ে গেল বটে হুইইশ করে আকাশ দিয়ে মস্ত বড় এরোপ্লেনটা রঞ্জনকে পেটের মধ্যে নিয়ে। মা, ঠাকুমা, পিসিমা কেঁদে ভেঙে পড়লেন। দাদারা, গাঁয়ের লোকরা বুঝিয়েসুঝিয়ে তাদের নিয়ে বাসে তুলল। ব্যানার্জিবাবু আর গিন্নিমা এসেছিলেন, তাঁরাও অনেক বোঝালেন। "আমার মেয়েটাও তো ওখানে, আমার একটাই সন্তান। তোমার তো চারটে আরও ছেলে কাছে রইল।" গিন্নিমার কথা শুনে রঞ্জনের মা একটু শান্ত হলেন। "তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর তোমার ছেলেও ফিরবে, আমার মেয়ে, জামাই, নাতনি , সবাই ফিরবে, সেই দিনটার কথাই আমরা ভাবি এসো।" গিন্নিমা আদর করে বোঝালেন রঞ্জনের মাকে।

রঞ্জন প্লেনে উঠে বসল। সিটবেল্ট বেঁধে নিল। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক পাশের সিটেই আছেন, তিনি থাকায় খুব সুবিধে। সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। রঞ্জনের হিন্দি তত ভাল নয়, তাঁর বাংলাও তথৈবচ। তবু দু'জনের কথাবার্তা চালাতে কোনওই অসুবিধে হচ্ছে না। প্রথমে প্লেনের এয়ারহস্টেস দিদিরা ছিল সবাই শাড়ি-পরা।

রঞ্জনের জলতেষ্টা পেল, সে বোতাম টিপে দিতেই একজন দিদি এলেন। রঞ্জন বলল, "এক গ্লাস জল খাব দিদি।"

"নিশ্চয়ই।" বলে তিনি এক গ্লাস জল এনে দিলেন, হাসিমুখে পাতলা প্লাস্টিকের গেলাসে, বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা জল। আঃ! গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল রঞ্জনের। কী আশ্চর্যভাবে শূন্যে উঠে গেল প্লেনটা! নীচে ছোট্ট-ছোট্ট হয়ে গেল কলকাতার সব বাড়িঘর, গাছপালা, নদী, পুকুর, খেত। রঞ্জনের চোখ জলে ভরে উঠছিল। এখান থেকে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীকান্তপুর দেখা যাচ্ছে। কে জানে কোন্‌খানে ওদের গ্রামটা! বাবা যেখানে বসে-বসে হুঁকো টানছেন একা-একা। বাড়িতে কেউ নেই, সবাই আজ কলকাতাতে। বউদিরা আছে অবশ্য। ভাইপো-ভাইঝিরাও আছে। ওইসব সবুজ গাছপালা, খেত, পুকুরের মধ্যেই কোথাও রয়ে গেছে রঞ্জনের গাঁ, ওদের বাড়িটা।

আস্তে আস্তে আরও ওপরে উঠে এল প্লেন, নীচে কেবল সাদা-সাদা মেঘ। নীচের দিকে তাকিয়ে মেঘ দেখা যায়, জীবনে এই প্রথম দেখল রঞ্জন।

মেঘ দেখতে তো লোকে ওপরদিকে ঘাড় তোলে। প্লেনে সবই উলটো। এ তো মাটি দিয়ে যাওয়া নয়, এ হচ্ছে পুষ্পকরথে চড়া। শূন্যে ভেসে যাওয়া।

রঞ্জনের কপরল ভাল। তার গা গুলোয়নি, মাথা ঘোরেনি। অফিসের লোকেরা একটা ওষুধ দিয়ে দিয়েছিল প্লেনে উঠেই খাওয়ার জন্য। তাতে ঘুম পাবে, আর গা গুলোবে না। কিন্তু রঞ্জন ওষুধটার কথা এক্কেবারে ভুলে মেরে দিয়েছে প্লেনে চড়ার উত্তেজনায়। জীবনে কখনও প্লেনে চড়া হবে, কে ভেবেছিল?

"একদম নামবে সেই টোকিওতে গিয়ে।" রঞ্জনকে বলে দিয়েছেন ব্যানার্জিবাবু।

"টোকিওতে তোমার ছ'ঘণ্টা ওয়েট করতে হবে, কোথাও নড়বে না, ওখানে তুমি কোথায় ওয়েট করবে, এই খেম্‌কাবাবুই তোমাকে দেখিয়ে দেবেন। সেইখানে বসে থাকবে। ভাবনার কিছু নেই, প্লেনের নম্বরটা তো জানো, যখন সেই নম্বরটাকে ডাকবে তখন যাবে।"

রঞ্জনের সামনে এসে দিদিমণি জিজ্ঞেস করছে, ডিম খাবে কিনা? ভেজ, না ননভেজ?

ব্যানার্জিবাবু বলে দিয়েছেন ননভেজ মানে কিন্তু নিরামিষ নয়। ভেজ মানেই নিরামিষ।

"তুমি বলবে ননভেজ।"

যেই দিদি জিজ্ঞেস করেছে, রঞ্জন বলেছে "ননভেজ।"

সুন্দর ডিমের ওমলেট এল। চা না কফি? চা, বাবা, চা।

চা, ওমলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল একটু রঞ্জন। সিটগুলো একটুখানি হেলে যায় পেছনদিকে। শোওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। শুনেছে ফার্স্টক্লাসে নাকি খাটবিছানা থাকে। কে জানে ফার্স্টক্লাস কেমন?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে রঞ্জনের মনে হল প্লেনটা পড়ে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, হ্যাঁ, ঠিকই। তেরছা হয়ে বেঁকে কেমন যেন বাঁকা ভাবে নেমে যাচ্ছে প্লেনটা, নীচে জমি, ঘরবাড়ি ঘুরে যাচ্ছে, ভীষণ ভয়ে বুক কেঁপে উঠল রঞ্জনের।

দু'হাতে সিটের হাতল দুটো চেপে ধরল। মায়ের মুখটা, বাবার মুখটা, ঠাকুমার মুখটা, ছোট ভাই দুটোর মুখ, হাতল দুটো চেপে ধরে কী লাভ? প্লেন যদি পড়ে, সিটসুদ্ধুই তো পড়বে। ঠাকুরের নাম করাই ভাল। ওই যে বলেছিলেন, একদিন তো মরতেই হবে, না হয় প্লেনে চড়েই মরব,—ঠাকুর ওই কথাটাই শুনলেন!

"প্লেনটা কী পড়ে যাচ্ছে?" রঞ্জন জিজ্ঞেস করল খেমকাবাবুকে। খেমকাবাবুকে দেখে মনে হচ্ছিল না ভয়ের কিছু হয়েছে, রঞ্জনের কথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন। "না, না, পড়বে কেন? নামছে! ব্যাঙ্ককে নামবে, যাত্রী তুলবে তো? বাস যেমন স্টপে থামে, ট্রেন যেমন ইস্টিশনে থামে, প্লেনও তেমনই দেশে-দেশে নামে তো? টোকিওর আগে ব্যাঙ্ককে একবার থামার কথা। তোমাকে কেউ বলে দেয়নি?" অভিমানে এবার চোখে প্রায় জল আসে রঞ্জনের। প্রাণের ভয়েও তার কান্না আসেনি এতক্ষণ। কেউ তাকে একবারও বলেনি যে, টোকিওর আগেও প্লেন একবার নামবে। আর টোকিও যে এটা নয়, সেটা সময়ের হিসেব থেকেই টের পেয়েছে রঞ্জন। যাক, এবার ভয় কাটল। খেমকাবাবু বললেন, "আবার বেল্ট বাঁধো। কানে তুলোটা গোঁজাই ছিল।

ব্যাঙ্ককের পরে শাড়িপরা দিদিরা নেমে গেলেন, ফ্রকপরা মেমদিদিরা উঠলেন। এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ভেজ? অর ননভেজ?"

এরা বাঙলা জানে না, রঞ্জন দেখেই বুঝতে পারছে, "ননভেজ"।

"চিকেন, অর বিফ?"

বিফ খেতে ঠাকুমা ভীষণ বারণ করে দিয়েছেন। বিফ মানে গরুরু মাংস, রঞ্জন জানে। "যাই করিস দাদা, ওদেশে গিয়ে গরুর মাংসটা, শূকরের মাংসটা খাসনি যেন—"

রঞ্জন ভেবে দেখেছে, মাংস সবই এক। সে খাসি মারলে খাসিরও ব্যথা

লাগে। যে-জন্তুই মেরে খাও, সেটা জীবহিংসার ব্যাপার। হয় অহিংসা প্র্যাকটিস করে নিরামিষ খাওয়া উচিত, নইলে যে মাংস হোক সবই খাওয়া এক। রঞ্জনের নিজের এমন মনে হয় বটে, কিন্তু মা-ঠাকুমার কথাটা শুনতে হবে তো!

খেমকা বললেন, "ভেজ!"

"চিকেন!" বলে দিল রঞ্জন।

তারপর এল খাবার।

খেমকার জন্য কীসব সেদ্ধ-সেদ্ধ, শাকসবজি, গাজর, শিম, আলু-মটর— আর রঞ্জনের জন্য সাদা রঙের চিকেন। সাদা জলের মধ্যে সাদা মতন চামড়া ছাড়ানো মাংস। আর কিছু সবজিসেদ্ধ।

রঞ্জনের দেখেই মনে পড়ল, বাবুঘাটে গঙ্গার জলে মরা জীবজন্তু ভেসে যায়। একবার একটা মরা কুকুর দেখেছিল, তার গা কেমন সাদা-সাদা, জলে ভিজে ফোলা-ফোলা, মনে পড়া মাত্র রঞ্জনের খাওয়ার ইচ্ছে চলে গেল। রুটি, মাখন, পুডিং, স্যালাড এইসবও ছিল, সেগুলো খেয়ে আসল মাংসের ডিশটা আর ছুঁতেই পারল না রঞ্জন। ওই সাদা রঙের মাংস, দেশের চিকেন কী সুন্দর। রঞ্জন নিজেই কী চমৎকার রাঁধতে পারে চিকেন, আর এই! ওদেশে গিয়ে কি এমনই সাদা-সাদা চিকেন খেতে হবে? তার চেয়ে নিরামিষ খাওয়া ঢের ভাল বাবা।

ঘুম ভাঙতেই টোকিও। খেমকাবাবু নেমে গেলেন রঞ্জনকে নিয়ে। এখানে তাকে বাক্স বের করতে হবে না। যেখানে সানফ্রান্সিসকোর প্লেন ধরতে হবে সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে গেলেন খেমকাবাবু। আর খোঁজ করতে লাগলেন, বাঙালি কেউ সানফ্রান্সিসকো যাচ্ছে কিনা? নাঃ। কেউ না।

রঞ্জন একবর্ণ ইংরিজি জানে না, একবর্ণ জাপানিও জানে না টোকিওতে অদ্ভুত সুরে কেবল জাপানি ভাষাতে কী সব ঘোষণা হচ্ছে মাইকে, মাঝে-মাঝে ইংরিজিতেও। রঞ্জন কিছুই বুঝতে পারছে না। এদিকে খেমকাবাবুকে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, তাঁকে নিতে এসেছে। তাঁর কাস্টম্‌স আছে। তাঁর আর দেরি করলে চলবে না।

রঞ্জনের হঠাৎ ভীষণ ভয় করল। যদি ওকে ছেড়ে প্লেনটা চলে যায়? এই টোকিও এয়ারপোর্টেই কি তবে সারাজীবন? কী করে কাউকে বোঝাবে রঞ্জন, সে কী চায়, কোথায় যাবে? কোন ভাষাতে বোঝাবে? শুণ্ডি রাজার দেশে "আমরা বাংলাদেশের থেকে এলাম" বলা যেত, এখানে চলবে না। খেমকাবাবু খুব দুঃখিত হয়ে 'গুডবাই' করে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে রঞ্জন যে কোম্পানির প্লেনে

যাবে, তার একজন কর্মচারীকে ধরে এনে রঞ্জনকে চিনিয়ে দিয়ে গেলেন, কিন্তু সেই লোক তাঁকে বলল, সে ছ'ঘণ্টা পরে ডিউটিতে থাকবে না। কিন্তু আরেকজনকে বলে দিয়ে যাবে। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে রঞ্জন টোকিও এয়ারপোর্টে বসে রইল।

হঠাৎ সে শুনতে পেল এক বৃদ্ধ পঞ্জাবি, শিখ ভদ্রলোক 'সানফ্রান্সিসকো' শব্দটা বলছেন। অমনই রঞ্জন দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আপ সানফ্রান্সিসকো যায়েগা?"

ভদ্রলোক বললেন, "ক্যায়া বলতে হ্যায়?"

রঞ্জন বুঝল উনি কানে কম শোনেন। রঞ্জন চেঁচিয়ে বলল, "আপ সানফ্রান্সিসকো যাতা হ্যায়?" একে রঞ্জনের অপূর্ব হিন্দি, তায় উনি কানে শোনেন না। সাদা দাড়ি সাদা পাগড়ি ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, "নাহি হাম সানফ্রান্সিসকো যায়েগা।"

রঞ্জন আবার চিৎকার করল, "হামভি উহাঁই যাতা হ্যায়। একসাথ যায়েগা।?"

ভদ্রলোকও বেশ চেঁচিয়ে বললেন, "হাম সানফ্রান্সিসকো যায়েগা।"

এই সময়ে রঞ্জন দেখল ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে তারা দু'জনে মিলে, আর সবাই তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। যা বোঝবার তা বোঝা হয়ে গিয়েছে। এখন ভদ্রলোক যা করবেন, যেভাবে যাবেন, রঞ্জন অবিকল তাঁর পিছু-পিছু যাবে।

সেইভাবেই টোকিওর ছ'ঘণ্টা কেটে গেল রঞ্জনের। সেই শিখ ভদ্রলোকের পিছু ধরে ঠিকঠাক প্লেনে উঠে পড়ল সে। সানফ্রান্সিসকোতে কাস্টম্‌সে কেউই কিছু বলল না ওকে, আর বেরিয়েই দ্যাখে দিদি, জামাইবাবু, সেনাসুদ্ধু এসে খুব হাত নাড়ছে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে!

আঃ! এই তা হলে আমেরিকা! সানফ্রান্সিসকো শহরটা কী সুন্দর! উঁচু-নিচু সব পাহাড়ি রাস্তা, এক-একটা পাড়া এক-একরকমের। খুব উঁচু-উঁচু বিশ-পঁচিশতলা বাড়িও রয়েছে, আবার দোতলা, তিনতলা, একতলা বাড়িও আছে। দিদিদের পাড়াটা খুব সুন্দর। সমুদ্র দেখা যায় বারান্দা থেকে। গোল্ডেন গেট ব্রিজ বলে একটা ব্রিজ দেখা যায়। যেটা দেখেই রঞ্জনের হাওড়া ব্রিজের জন্য মন কেমন করতে লাগল।

রঞ্জন এসে দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে ক'দিনের মধ্যে জমিয়ে বসল। আস্তে-আস্তে অভ্যেস হয়ে গেল বিলিতি রান্নাঘরে রান্না করা, বিলিতি বাথরুমে স্নান, টেবিলে খাওয়া, ঘরে চটি-পরা।

তিন বছর হয়ে গেছে। রঞ্জনের ফেরার দিন এসে গেছে। রঞ্জনের দিদি-জামাইবাবু, রঞ্জন, সোনা, সবাই ফিরছে। কিন্তু রঞ্জন আবার ফিরে আসছে।

রঞ্জনের আর-একটা চাকরি হয়েছে। সানফ্রান্সিসকোতে যে ইন্ডিয়ান রেস্তরাঁতে দিদি-জামাইবাবুরা মাঝে-মাঝে খেতে যেতেন, সেইখানে, বাংলাদেশের মানুষ, গৌরভাইয়ের সেই রেস্তরাঁতে। ইদানীং গৌরভাইয়ের ব্যবসা অনেক বেড়েছে, একটা নতুন দোকান খুলছেন সাউসালিতোতে, সেখানে নতুন লোক দরকার। ভাল বাংলা রান্না জানে এমন লোক। রঞ্জনকে গৌরভাইয়ের খুব পছন্দ। রঞ্জন দেশে গিয়ে বাবা, মা, ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে আবার ফিরে আসছে সানফ্রান্সিসকোতে, রেস্তরাঁতে চাকরি নিয়ে।

গৌরভাই বলেছেন, বউকেও আনতে পারবে, সীতাবউদির একটা সঙ্গী হবে। দেখা যাক, মা কী বলেন! দিদি, জামাইবাবু মনে করছেন এটা খুব ভালই ব্যবস্থা। আস্তে-আস্তে ওর নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে পারবে রঞ্জন একদিন। মা ওকে তাঁর নিজের হাতের কাজটা শিখিয়েছিলেন, ভাগ্যিস! মাকে রঞ্জন গিয়ে বলবে, "দ্যাখো মা, তোমার শেখানো বিদ্যেয় তোমার ছেলে আজ...।" আর বাবা কী বলবেন? প্লেন ভেসে যাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে। রঞ্জন এখন খুব সুন্দর ইংরিজি বলতে পারে। ওর কলেজে পড়া ভাইদের চেয়ে ভালই নিশ্চয়।

এয়ারহস্টেস জিজ্ঞেস করলেন, "ভেজ অর ননভেজ?"

"ননভেজ।" রঞ্জন একমুখ হেসে বলল, "বাট নট চিকেন, থ্যাংকইয়ু! ফিশ প্লিজ!"

প্রকাশকাল : ১৪০২ বঙ্গাব্দ

সবুরে মেওয়া ফলে

"হাল্লো, 464-1808?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বলুন।"

"যাক বাবা, পাওয়া গেল তা হলে!" বিশাল এক স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস পড়ল কাজের মধ্যে, ফোঁস করে।

"এই তো, এই নম্বরটাই চাইছি। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে। অন্তত পঞ্চাশ-ষাটবার—উঃ—"

"এই নম্বরে কাকে চাইছিলেন?"

"...." গভীর নিস্তব্ধতা। শ্বাসপ্রশ্বাস।

"কী হল? কাকে চাই আপনার?"

"...." আরও গভীর নিস্তব্ধতা। শ্বাসপ্রশ্বাসও বন্ধ।

"আরে, এ তো বেড়ে মজা! এত কষ্ট করে আপনি কাকে ফোন করছেন? নামটা বলবেন তো?"

"আরে, সেইটেই তো মনে করতে পারছি না।" ভদ্রমহিলা প্রায় কেঁদে ফেলেন!"

"মনে করতে পারছেন না? ও!" আমি যারপরনাই লজ্জিত। একদিন আমারও এমনই হতে পারে।

"জানি, জানি, বিশ্বাস করছেন না তো? কিন্তু বিশ্বাস করুন ভাই, সত্যি বলছি মনে পড়ছে না। কেন যে ফোনটা করছিলুম, কাকে যে চাইছিলুম, কিছুই আর মনে পড়ছে না।"

"না না, বিশ্বাস করব না কেন? এমন তো হতেই পারে। এতক্ষণ ধরে একটা নম্বরের জন্য ধস্তাধস্তি করতে-করতে এরকম তো হতেই পারে। আপনার নিজের নামটা মনে আছে তো?" আমি যথাসাধ্য সহানুভূতি দেখাই।

"ঠাট্টা করছেন?"

"ছি, ছি, মোটেই না। আপনার স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। খেই ধরিয়ে দিচ্ছি।"

"জুবিলি মিত্র। কী? কিছু বুঝলেন?"

"জুবিলি মি-ত্র? ঠিক মনে করতে পারলুম না। আমার নম্বরটা আপনি পেলেন কোথায়?"

"এই যে, একটুকরো কাগজে।

"কাগজটা কোত্থেকে এল?"

"টেবিলে চাপা দেওয়া ছিল। URGENT লেখা আছে।"

"কে রাখল টেবিলে?"

"আমিই রেখে থাকব।"

"কে দিল নম্বরটা আপনাকে?"

"সেটাই তো ভুলে গেছি। শুধু বড় বড় করে লেখা রয়েছে রোববার সকালেই ফোন করতে হবে। কী অদ্ভুত কাণ্ড বলুন তো? ভুলে গেলুম কী বলে?"

"ভুলচুক মানুষের হতেই পারে। তা, ওই হাতের লেখাটা কার?"

"আজ্ঞে?"

"হাতের লেখাটা কি চিনতে পারছেন?"

"পারছি।"

"কার হাতের লেখা?"

"আমার।"

"আপনিই লিখেছেন? নিজের হাতে?"

"তাই তো দেখছি।"

"কেন লিখেছেন, মনে নেই?"

"তাই তো দেখছি।"

"মনে করবার চেষ্টা করুন। আমি বরং—"

"প্লিজ! প্লিজ! ছেড়ে দেবেন না ভাই! অনেক কষ্টে নম্বরটা পেয়েছি। পড়বে, পড়বে, ঠিক মনে পড়বে—এত রকমের ঝুটঝামেলায়, ইলেকশানের ঠেলায় সব ভুলে গেছি। আমার ঠাকুরপো আবার হেরে গেছেন তো এ-বছরেও।"

"আহা! কোন্ দল?"

"এ-বছরও ওই একই দল। সত্যি, আজকাল সবকিছু বড্ড ভুলে যাই। ছেড়ে দেবেন না প্লিজ, এক্ষুনি ঠিক মনে পড়ে যাবে। একটু সবুর করুন।"

"এখন কোনটা মনে করছেন?"

"এই আপনাকে কেন যে টেলিফোন করলুম সেটাই ভাবতে চেষ্টা করছি। খুব চেষ্টা করছি। আমার ব্রেনওয়েভ হয়।"

"আচ্ছা, আপনি রামকৃষ্ণ মিশন চাইছিলেন না তো?" আমি সাহায্য করতে শুরু করি।

"রামকৃষ্ণ মিশন? না তো? কেন চাইব?"

"না। এমনই। কিংবা বিনীতা মৈত্রকে? ওঁদের নম্বরগুলোর সঙ্গে এই নম্বরটা প্রায়ই গুলিয়ে যায় কিনা? এখানে ওঁদের খুব ফোন আসে তো? তাই চেক করছিলুম, রং নম্বর হল কি না?"

"রং নম্বর কেন হবে? এইটেই তো পস্ট লেখা রয়েছে। গোড়াতেই চেক করেছি। ঠিক নম্বরই, 464-1808 তো?"

এবার আমি বিনয়ের অবতার হয়ে প্রশ্ন করি, "আচ্ছা, আপনার ছেলেমেয়েরা কেউ কি এ-বছর হায়ার সেকেন্ডারি, কিংবা বি এ পরীক্ষায় পাশ করেছে? খুবই ডেঞ্জারাস প্রশ্ন ('বাঁশ, তুমি কেন ঝাড়ে? এসো আমার ঘাড়ে')।

"আমার তো ছেলেপুলে নেই? ওই বুলটু, আমার দেওরপোই ছেলের মতন।"

কম্পিতস্বরে বলে ফেলি, "বুলটুকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করতে-"

"যাদবপুরে যাবে কেন মরতে? সে তো খড়্গাপুরেই চান্স পেয়েছে। আশ্চর্য কথা বাপু!" সত্যিই তো, খড়্গাপুর থাকতে—"

"সরি, মানে অ্যাডমিশনের জন্য অপরিচিত অনেকেরই টেলিফোন আসে কি না? তাই ভাবলুম আপনিও যদি—আমার অবশ্য ভর্তিতে কোনওই হাত নেই, কিন্তু লোক তো অত বোঝে না?"

অ্যাডমিশন নয়, তা হলে কী হতে পারে? প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন?

"আচ্ছা, কোনও স্কুলে পড়ান কি আপনি? কিংবা কলেজে?"

"না ভাই, সে কপাল কি করেছি যে, চাকরি করব?"

"হুম। তবে কি আপনাদের কোনও মেয়েদের ক্লাব আছে? মহিলা সমিতি?"

"সে ইচ্ছে কি আর করে না? খুব করে। কিন্তু মহিলা সমিতি করবার সময় পেলে তো? যা শুচিবাই আমার শাশুড়ির! সংসারে দিনরাত্তির হুলুস্থুল কাণ্ড চলছে—অথচ আজকাল আর শুচিবাই রোগটা কারও হতে শুনি না। কেবল

আমার কপালেই বাকি ছিল!''

অ্যাডমিশনও নয়। ইস্কুলও হল না। মহিলা সমিতিও না, তবে?

''আপনিও কি কোনও মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ থাকেন? আপনাদের ওখানে কোনও উৎসব-টুৎসব—''

''কোথায় আর হলাম মাল্টিস্টোরিড? প্রোমোটারের সঙ্গে সব কথা ঠিক, এমন সময়ে 'শিবালিক' হল। ব্যস! আমার ভাসুর বেঁকে বসলেন। ওই থে-কে সেই দোতলাই রয়ে গেছি। এ-পাড়ায় সবই এইরকম। ওল্ড ফ্যাশনের বাড়ি।''

''বাঃ! তবে তো আপনাদের পাড়াটা বেশ চমৎকার? আচ্ছা, পাড়ার কোনও ক্লাবের কিছু আছে? যেমন ধরুন—এই—'বসে আঁকো' কিংবা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, মানে আপনাদের—। পৌরোহিত্য করতে লোক লাগবে?''

''পুরুত? পুরুত লাগবে কি না? —না ভাই আমাদের পুরুতটুরুত চাই না। কেন, ভট্‌চায্যিমশাই নেই? কেন, আপনি বুঝি পুরুতঠাকুর সাপ্লাই দেন?''

''কী যে বলেন! আমি তো কেবল আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি—যদি এই করতে-করতে আপনার কিছু মনে পড়ে যায়! আমার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে আপনার কী-কী দরকার থাকতে পারে, একটা-একটা করে আমি সেটাই ভাবছি। পুরুত বলিনি, এ হচ্ছে 'পৌরোহিত্য'। মানে পাড়ার জলসা-টলসায় অনেক সময় পৌরোহিত্য করতে লোকটোক লাগে তো? প্রদীপ জ্বালাতে-টালাতে।''

''আমাদের পাড়ার জলসা? দা-রু-ণ হয় ভাই—কুমার শানু নিজে এসেছিল দু'বছর আগে। আর এ-বছরে রফিকণ্ঠে মামুন এমন গাইল না—খোয়া-খোয়া চাঁদ—একদম পারফেক্ট! চোখে না দেখলে আপনি ভাবতেই পারতেন না যে, রফি নিজে গাইছে না।''

না, এই লাইনটাও ধরল না। তবে কি হতে পারে ইনি একজন অস্ফুট কবি? যে সব উচ্চাকাঙ্খী নারী সামান্য একটু উৎসাহের অভাবে দিনে-দিনে অল্প-অল্প করে ফুরিয়ে যাচ্ছেন, ইনি কি তাঁদেরই একজন? তবে তো এঁকে উৎসাহ দেওয়া আমার কর্তব্য —'এইসব মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।'

''আচ্ছা ভাই, আপনি কি লেখেন টেখেন?''

''লিখিটিখি? কী লিখি?''

''এই ধরুন গল্প, কবিতা, কিংবা ডায়েরি?'' আজকাল আবার ডায়েরিটা মেয়েদের সাহিত্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ।''

''ওই ডায়েরিটাই লিখি। রোজকার হিসেব, বাজারের হিসেব, টেলিফোনের

হিসেব—এইসব।”

“অ। আচ্ছা—তা—হলে!—আচ্ছা? আপনার দেওরপোর কি কোনও লিট্‌ল ম্যাগাজিন আছে? মানে ওদের বন্ধুবান্ধবদের—”

“আমার দেওরপো বুলটু তো খড়্গপুরে পড়ছে। এক্ষুনি বললুম না? লিট্‌ল ম্যাগাজিন-টিন তো যত বেকার ছেলেগুলো বের করে। ওর সময় কই ওসব করবার?”

“তা বটে! তা হলে আপনার স্বামীর অফিসের কোনও সুভেনিরে লেখা চাই কি?”

“লেখালিখি নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন বলুন তো? আপনি কি লেখেন না কি? অ্যাঁ?”

“ওই একটু-আধটু।”

“তবে যে বললেন যাদবপুরে অ্যাডমিশনের চাকরি করেন?”

“ঠিক অ্যাডমিশনের চাকরি নয়, তবে ওই হল। আসলে আমি আপনাকে হেল্‌প করতেই চেষ্টা করছি। কেন হঠাৎ আপনার কাছে আমার নম্বরটা গেল, সেটাই ভাবছি। আচ্ছা, কোনও দৈনিক পত্রিকায় কাজ করেন কি আপনার কোনও আত্মীয়স্বজন?” (হয়তো কোনও ইন্টারভিউয়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছেন।)

“পত্রিকা? আগে আমার বড়মামা অবশ্য কাজ করতেন ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায়। এখন মামাও নেই, ভারতবর্ষও নেই।”

কোনওটাই যে লাগছে না। এ কী আজব কাণ্ড? লেখা চায় না, ভর্তি করতে চায় না, পৌরোহিত্যে করাতে চায় না, সাক্ষাৎকার চায় না, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করাতে চায় না, তবে চায় কী? মহিলা সমিতি নয়, পথসভা?

“আপনার দেওর কি কোনও পথসভা ডাকবেন? আবর্জনা-সাফাই কিংবা নারী নির্যাতন অথবা কোনও বন্ধ কারখানা খোলার জন্যে?”

“না, না, সে তো হেরে ভূত হয়ে গিয়েছে। এখন আবার কিসের পথসভা? ওসব করে বটে, ওই ইলেকশনের মুখে-মুখে। আমি ওসবে যাই না। ওই হুল্লোড়ের মধ্যে কে যাবে?”

“আমিও যাই না।”

“তবে? তবে এ-কথা উঠছে কেন?”

“উঠছে, কেননা আপনি আমার নম্বরে ফোনটা করলেন কেন, সেটা তো আমায় আপনি বলতে পারছেন না। আমি তাই এমনি এলোপাতাড়ি ঢিল ছুঁড়ছি অন্ধকারে।”

হঠাৎ একটা আলোকশিখার উদয় হয়।

"আচ্ছা, আপনি কি নরেন্দ্র দেব কিংবা রাধারানী দেবীর কোনও আউট অব প্রিন্ট বই খুঁজছেন, কিংবা অপরাজিতা রচনাবলী?"

এই কারণেও প্রায়ই ফোন পাই।

"নরেন দেবের 'ওমর খৈয়াম' আর 'মেঘদূত'? আহা-হা—কী চমৎকার সব ছবিওলা—দুটো বই-ই তো আমাদের আছে। আর রাধারানী দেবীর 'মিলনের মন্ত্রমালা' আমি বিয়েতে সাতখানা উপহার পেয়েছিলুম। আবার কেন খুঁজতে যাব? অপরাজিতা রচনাবলীটা আবার কার লেখা?"

"ও কিছু নয়। আচ্ছা, আপনি কারও জন্য বাড়িভাড়া খুঁজছেন না তো?"

"আপনি বুঝি বাড়ি খুঁজে দেন? শুনেছি বটে আজকাল মেয়েরাও দালালি করে।"

"আমি ঠিক দালালি করি না, তবে আমাদের একতলাটা খালি আছে বলে লোকে প্রায়ই ভাড়া চেয়ে ফোন করে কি না, তাই বলছিলুম হয়তো আপনিও—কিংবা আপনি কি ভাল কাজের লোক খুঁজছেন?"

"আছে? আছে? কাজের লোক ভাল আছে আপনার সন্ধানে? বাঃ, বাঃ, দারুণ কাজের লোক তো আপনি?" রিসিভারে আহ্লাদ উথলে ওঠে। গলার স্বর পালটে গেছে।

"না আমিও দারুণ কাজের লোক নই, আমার কাজের লোকেরাও খুব একটা কাজের লোক নয়। এতৎসত্ত্বেও আমার কাছে অনবরতই কাজের লোক চেয়ে ফোন আসে কি না? তাই জিজ্ঞেস করছি। কিংবা নার্স। ভাল নার্স চাই কি? কিংবা আয়া? রুগির কাজের লোক? আমার মা তো অনেকদিন অসুস্থ ছিলেন, তাই লোকে আমার কাছে এখনও রুগির কাজের লোক চায়।"

"দুগ্‌গা, দুগ্‌গা। কাজ নেই আমার নার্স-আয়া দিয়ে! বলতে নেই, শ্বশুরমশাই চলে যাওয়ার পরে, আমাদের বাড়িতে তেমন কোনও রুগি নেই। যত অলুক্ষুণে কথাবার্তা! এবার বলবেন, খাট চাই? ফুল চাই?"

"ষাট, ষাট, ও কী কথা? ওসবের জন্য এখনও আমাকে কেউ ফোন করেনি। তবে কিসের জন্যে আমাকে দরকার ছিল আপনার? নিজে-নিজে একটু ভেবে দেখবেন তো? কী আশ্চর্য! আচ্ছা—আপনার কি কোনও ফোন নম্বর চাই? এই ধরুন কোনও লেখকের? গায়ক? সাংবাদিক? অধ্যাপক? শিল্পীর? এমনকী আইনজীবীর, ডাক্তারের ফোন নম্বর চেয়েও লোকে আমাকে ফোন করে। আমি অবশ্য কিছুই দিতে পারি না। কেন না আমার ফোনের ডায়েরিটাই হারিয়ে গেছে।

আর কারও হয়তো খুব দরকার ছিল। ওঃ হো—আর একটা পসিবিলিটি আছে। আমাদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির কাউকে চাই না তো? এই ফোন নম্বরটা এ পাড়ার আরও অনেকেই ব্যবহার করেন তো? কিংবা ধরুন নিলু দাস, অমিত মণ্ডল, শিবু পাল, গাবলু পাল, বিন্দু হালদার, কানাই বাউরি—এঁদের কাউকে চাই কি? এঁরা সকলেই যে এখানে থাকেন, তা নয়, কিন্তু আমি এঁদের জন্যে মেসেজ রাখতে পারি।"

"এরা সব কারা? এদের সঙ্গে আমার কিসের দরকার?"

"আমি সেটা বলব কেমন করে বলুন? দরকার তো হতেই পারে মানুষের, মানুষকে।"

"না। আমি ওদের চিনিই না। ধুত্তেরিকা! আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল!"

"ব্যস মিটে গেল। আপনি কি তবে কবিতা সিংহ, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, বাণী বসু, মহাশ্বেতা দেবী এঁদের কাউকে চাইছেন?" কিংবা শ্রীমতী রাধারানী দেবী কীর্তনিয়াকে?"

"কেন চাইব? ওঁরা আমার আত্মীয় না কুটুম? কারও সঙ্গেই আমার আলাপ নেই। লেখাটেখা অবশ্য পড়িচি। কীর্তনও শুনিচি।"

"দেখুন এর মধ্যে আপনার অনেক টিংটিং বেজে গেছে। এই ফোনকলটা কিন্তু আপনার দিল্লি-বম্বেতে ট্রাঙ্ককলের মতন দামি হয়ে যাচ্ছে, মনে পড়লে আবার করবেন বরং—এবার ছেড়ে দিন—" হঠাৎ ট্রাঙ্ককল প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আর-একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা যেজন্য প্রায়ই ফোন আসে।

"আচ্ছা, দাঁড়ান, আর-একটা কথা—আপনাকে কি কেউ প্রোফেসর অমর্ত্য সেনের ভারতবর্ষে আসবার দিনক্ষণ জেনে নিতে বলেছে? কিংবা তাঁর বিদেশের ঠিকানা?"

"প্রোফেসর অমৃত.... কী বললেন যেন দিনক্ষণের কথাটা? ওই তো, ওই জ্যোতিষীর কথা বলছেন তো? ওঁকে আমরা খুব চিনি। আপনাকে বলতে যাব কেন?"

ওটাও লাগল না। তবে? তা হলে নিশ্চয়ই এটা। আমিও মরিয়া, যাকে বলে ডেসপারেট। তাই। এটা লেগে যাবেই।

"আপনারা কি হিমালয়-ভ্রমণে যাচ্ছেন? কিংবা ইজরায়েলে কিংবা নর্থ পোলে?"

"হিমালয়ে কিংবা ইজরায়েলে? কিংবা নর্থপোলে? আপনার ভাই মাথাটা সত্যিই ঠিক নেই মনে হচ্ছে। আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা বলে সেই কবে থেকে

সিঙ্গাপুরে যাব-যাব করছি, ওই বুলটুর পরীক্ষার জন্যই যাওয়া আটকে আছে। ওর পরীক্ষার পরে সামনের বছরে বেরোচ্ছিই। ইজরায়েলে যেতে যাব কোন দুঃখে? মরুভূমি ছাড়া ওখানে আছেটো কী? কেবল যত মারামারি, কাটাকাটি, দাঙ্গাহাঙ্গামা। হিমালয়, না ইজরায়েল! সত্যি বাবা! আবার বলে নর্থ পোল। শুধু বরফের কারবার ওখানে—এমন উদ্ভুট প্রশ্ন মাথায় এল কী করে?''

''আসে, আসে। কতরকম প্রশ্নই তো মানুষের মাথায় আসতে পারে! জীবন কি যুক্তি মেনে চলে রে ভাই? এসব জায়গায় যাওয়ার জন্যও কেউ কেউ আমাকে ফোন করেছেন কি না? আবার একটা কথা মনে পড়ে—'কিংবা শান্তিনিকেতনে ঘরটর ভাড়া চাই?' —''ক'টার এজেন্সি নিয়েছেন দিদি আপনি? আপনার কি ট্র্যাভেল এজেন্সিও আছে না কি? রামকৃষ্ণ মিশনের নম্বর, অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা, পুরুত সাপ্লাই, জ্যোতিষী সাপ্লাই, বাড়িঘর ভাড়া দেওয়া, লেখা ছাপানো, 'রেয়ার' বইয়ের জোগান, কাজের লোক, রুগির নার্স, অচেনা লোকেদের ঠিকানা, ফোন নম্বর, এতরকম জিনিস সাপ্লাই দেন, আবার রেলের টিকিট, এরোপ্লেনের টিকিটপত্তরও করে দেন—বা—ব্বাঃ! পারেনও বটে! ধন্যি এনার্জি! আচ্ছা দিদি, আপনিই কি একটা আপিস খুলেছেন 'আস্ক মি' নামে?''

এবার আমার গলা খুব গম্ভীর হয়ে যায়। ''দেখুন, ফোনটা কিন্তু আপনিই করেছেন। আমার জরুরি সময় ধ্বংস করে, চা জুড়িয়ে ফেলে, আমি কেবল প্রশ্নগুলো করছিলুম আপনাকেই হেল্প করতে। আপনার ফোনের উদ্দেশ্যটা মনে পড়িয়ে দিতে।''

''এবার তবে আর হেল্পে কাজ নেই। ঢের হয়েছে। আমি রেখে দিচ্ছি। আপনি চা খান। আচ্ছা জ্বালা বাপু!''

কিন্তু আমারও জেদ চেপে গেছে। আর চমৎকার সব জরুরি দরকারও হুড়হুড়িয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে। এত অনন্ত সম্ভাবনাময় এই নম্বরটি, কে তা জানত? আমিই সাধি—

''না, না। ছাড়বেন না প্লিজ। এতক্ষণই যদি ধরতে পারলেন, তবে আর একটাই মোটে প্রশ্ন করব। উত্তরটা দিয়ে ছেড়ে দিন।'' উনি কঠোর—''একটাই প্রশ্ন কেবল! ঠিক তো? ওনলি ওয়ান! ব্যস।''

''ব্যস! এইবারই শেষ প্রশ্নটা করছি। আপনার মনে পড়ে যায় ভাল, না পড়লে উপায় নেই। আচ্ছা, আপনাদের কি দিল্লিতে কিংবা আমেরিকাতে কেউ আছেন? তাদের জন্য কোনও উপহার? এই ধরুন কোনও ছোটখাটো প্যাকেটট্যাকেট পাঠাবার আছে? পুজোর, কিংবা জন্মদিনের? আমার মেয়েরা

আপাতত কেউই কিন্তু আসছে না, আর আমারও যাওয়ার কথা নেই। অতএব আমার হাতে আপনার কিছু যদি পাঠানোর ইচ্ছে থাকে—''

''আপনার হাতে কিছু পাঠাবার ইচ্ছে আমার থাকবে কেন বলতে পারেন? আপনাকে কি আমি চিনি? না কি আমাদের দিল্লি-আমেরিকায় জিনিস পাঠানোর লোকের অভাব? দিল্লিতে তো আমার কর্তাই ছুটছেন মাসে তিনবার। আর এমিলি, আমার আপন বোন থাকে নিউ ইয়র্কে। বছর-বছর দেশে আসে। বুঝলেন? আপনাকে আমার মোটেই দরকার নেই। হ্যাঁ। এবার ছাড়ছি।''

''এমিলি?'' আমি আহ্লাদে আর্তনাদ করে ফেলি। ''দাঁড়ান, দাঁড়ান, প্লিজ ছাড়বেন না! নিউ ইয়র্কের এমিলির দিদি আপনি? আহা, আগে বলবেন তো! আমি ওর বন্ধু, নবনীতা।''

''ওঃ হো! তা তুমিই বা আগে বললে না কেন ভাই, অ্যাঁ মিছিমিছি এতক্ষণ ধরে টাঙিয়ে রেখেছ? আর আজেবাজে বকবক করছ? তোমাকেই তো ফোন করছি।'' দিদি এক ধমক লাগান। মিনমিন করে উত্তর দিই, ''আমাকেই? কেন বলুন তো দিদি? এমিলি আসছে না কি? গত মাসে তো আসবে বলেও এল না।''

''সেই কথাটাই তো বলছি। এ-মাসে ছুটিটা পাচ্ছে, কুড়ি তারিখে আসছে, তোমাকে জানাতে বলেছিল। তখন কাগজে তোমার নম্বরটাই টুকেছিলুম, নামটা আর লিখে রাখিনি। যাক, তুমিই তবে নবনীতা? আর এতক্ষণ আমি ভাবছি বুঝি কোনও ভদ্রমহিলা! কী গো, দেখলে তো! বলেছিলুম একটুখানি সবুর করো, ঠিক আমার সব মনে পড়ে যাবে। সেই, ধরে তো ফেললুম? তুমি ভেবেছিলে মনে করতে পারব না? হুঁঃ।''

প্রকাশকাল : ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

শুক্তিমতী

মহাভারতে কোলাহল নামে একটি পর্বতের কথা আছে। পর্বতের কোথায় শান্ত গম্ভীর স্বভাব থাকবে তা নয়, তার খাদে খাদে, গুহায় গুহায় ঝর্ণার ঝিরিঝিরি, জলপ্রপাতের গুম্‌গুম্‌ শব্দ, তার বনে বনে পাখিদের কলকাকলি, বাঁদরদের কিচিরমিচির, বাঘের গর্জন, হাতির বৃংহিত শোনা যেত, আর তারই প্রতিধ্বনি বাজতো মালভূমিতে, মালভূমিতে। তাই সেই পর্বতের নাম ছিল, কোলাহল।

কোলাহল পর্বতের বনভূমিতে একটি বিশেষ সম্পদ ছিল। একটি সুগন্ধী, সুমিষ্ট, অমৃত ফলের গাছ। দেবতারাও মাঝে মাঝে সেই অমৃতফল খেতে নেমে আসতেন। আর ছিল এক স্ফটিক স্বচ্ছ নীল দীঘি। সেখানে ফুটতো অম্লান পঙ্কজ। প্রতি দুই যামে একটি করে ফুল ফোটে। দীঘিতলের পঙ্কে জন্মে সেই পদ্ম সূর্যের দিকে গ্রীবা তুলে দাঁড়ায়। স্বর্গ থেকে কিন্নরী অপ্সরীরা আসতেন সেই পুষ্প আহরণ করতে। অম্লান পঙ্কজে যে মালা গাঁথা হয় তার নাম বৈজয়ন্তীমালা। সেই মালাটি গাঁথতে দিনের পর দিন কেটে যায় বটে, কিন্তু মালার ফুল কোনোদিন শুকোয় না, সেই মালার মাদকতা ভরা সৌরভ কখনো মৃদু হয়ে যায় না। তার বর্ণ একটুও মলিন হয় না। একদিন শুক্তিমতী নামে একজন পরম গুণবতী কিন্নরী স্বর্গ থেকে কোলাহল পর্বতে নেমে এলেন। নীলদীঘির জলে স্নান করে, চুল এলিয়ে, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে তাঁর অম্লানপদ্মের মালাটি গাঁথতে বসলেন।

কোলাহল পর্বত এতদিন ধরে কত দেবদেবীকে দেখেছেন, এত অপ্সরী-কিন্নরী দেখেছেন কিন্তু সেই যে সকালবেলার নরম আলোয় এলোচুলে শুক্তিমতীকে দেখলেন আপনমনে বৈজয়ন্তীমালাটি গাঁথতে, তাঁর মনপ্রাণ একেবারে মুগ্ধ মোহিত

হয়ে গেল। কোলাহল এক সুপুরুষ যুবার রূপ ধারণ করে এসে, বললেন, "শুক্তিমতী, তুমি এই বৈজয়ন্তীমালাটি কার জন্য গাঁথছো?" শুক্তিমতী হেসে বললেন, "তা তো জানি না? যে নেবে, তারই। মালাটি তো শুধু গাঁথার আনন্দেই গাঁথছি, দেবার কথা এখনও ভাবিনি।"

কোলাহল তখন নতজানু হয়ে বসে শুক্তিমতীর সামনে অঞ্জলি পেতে বললেন, "শুক্তিমতী, তোমার মালাটি আমার কণ্ঠে পরিয়ে দেবে?"

শুক্তিমতী অবাক। তিনি বললেন, "তুমি কে? আমার হাতের মালাটি প্রার্থনা করছো কোন্ সাহসে?"

"আমিই কোলাহল পর্বত। যার কোলে তুমি এখন বসে আছো। তোমার মতো শ্রীময়ী কাউকেই আমি কোনোদিন দেখিনি, তুমি আমার পত্নী হবে? হিমালয়ের পত্নী যেমন মেনকা, তেমনি তুমি হবে কোলাহলের পত্নী। শুক্তিমতী? আমরা দেবতাদের আশীর্বাদ পাবো!"

শুক্তিমতীর গালদুটি গোলাপীই ছিল, এবার লাল টুকটুকে হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, "আগে তো মালাটা গাঁথা শেষ হোক? সবে তো আরম্ভ করেছি।"

তবু কোলাহল বললেন, "সুমিষ্ট অমৃতফলের ভোগ সাজিয়ে দেবো রোজ তোমাকে, পান করাবো এই অম্লানপদ্মের মধুতে তৈরি সুরা, সূক্ষ্ম মেঘের হালকা শাড়ি জড়িয়ে দেবো তোমার গায়ে—যা রেশমের চেয়েও নরম—বনের পাখিরা তোমাকে গান শোনাবে, হরিণরা হবে তোমার সখী, সিংহ তোমার দেহরক্ষী হবে, হাতি হবে তোমার বাহন—কিন্নরী শুক্তিমতী, তুমি কোলাহল পর্বতের বউ হবে? তারপরে মালাটি তুমি আস্তে আস্তে গেঁথো।" এতসব মিষ্ট বাক্য শুনে শুক্তিমতীর লজ্জা করছিল, তিনি চোখ তুলে কোলাহল নামে রূপবান যুবকটিকে দেখলেন। আপত্তির কিছুই তাঁর চোখে পড়লো না। আধখানা গাঁথা মালাটিই কোলাহলের গলায় পরিয়ে দিলেন শুক্তিমতী। তারপর তাঁরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর করতে লাগলেন। দেবতারা খুশি হয়ে পারিজাত ফুল উপহার দিলেন, চাঁদ উপহার দিলেন জ্যোৎস্না। ঢালু ফুলবনে সব ফুলগুলি ফুটে উঠলো।

কিছুকাল পরে কোলাহল আর শুক্তিমতী আর কোলাহলের একটি চন্দ্রকলার মতো মেয়ে হলো। তার নাম গিরিকা। গিরিকা যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী। চেদিদেশের রাজা মৃগয়া করতে এসে তাঁকে দেখতে পেয়ে রানী করে নিজের রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদে গিরিকা খুবই আদরে আছেন রাজার প্রাণাধিকা পাটরানী হয়ে। তবু মাঝে মাঝে মার জন্যে যখন মন উতলা হয়, অমৃতফলের স্বাদের জন্যে, বনফুলের গন্ধের জন্যে মন কেমন করে, রাজার

ঐশ্বর্যে আর মনপ্রাণ ভরে না, গিরিকা তখন কোলাহল পর্বতে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসেন, মা শুক্তিমতীর কাছে বিশ্রাম নিতে।

শুক্তিমতী একদিন গিরিকাকে কাছে ডেকে বললেন, "মা গিরিকা, আমার আর এই মর্ত্যবাস যে ভালো লাগছে না মা। মর্ত্যের জীবন তো আমার জন্যে নয়—আমি কিন্নরী, একদিন না একদিন আমাকে স্বর্গে ফিরে যেতেই হবে। তুমি বরং একটু তোমার অবুঝ বাবাকে বুঝিয়ে বলো। এবারে সময় হয়েছে, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। সামনের পূর্ণিমা রাতে আমি ফিরে যাবো।" শুক্তিমতী চলে যাবেন শুনে গিরিকা মর্মাহত হলেন, তবু মায়ের যুক্তিটা না মেনে উপায় নেই। কিন্তু এতে কোলাহল পর্বতের এতই মন খারাপ হলো যে তিনি আর কথাই বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ থেকে অবিরল জল ঝরতে লাগলো। "যেও না" এই কথাটিও তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না। শুক্তিমতী স্বর্গে ফিরে গেলেন।

কোলাহলের মন খারাপ দেখে পাহাড় সুদ্ধু সবারই মন খারাপ। বনে বনে পাখিরা আর গান গায় না, পশুরা গর্জন করে না, ঝর্ণারা কুলুকুলু শব্দে নৃত্য করে না, হাতি বৃংহিত ধ্বনি করে না, এমনকি গুহায়, মালভূমিতে, খাদে প্রতিধ্বনিও স্তব্ধ হয়ে রইল। কোলাহল পর্বতের নামটাই মিথ্যে হয়ে গেল। বাস্তবিক এত নিঃশব্দ পর্বত আর কোথাও রইল না।

ওদিকে শুক্তিমতীর স্বর্গে গিয়েও শান্তি নেই। কোলাহলের বিরহশোকে তিনিও ব্যাকুল। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বৃষ্টি হয়ে অবিশ্রান্ত ঝরে পড়তে লাগলো কোলাহল পর্বতের মাথায়। কোলাহলের চূড়োয় তখনও দুলছে তাঁরই পরিয়ে দিয়ে আসা আধখানা গাঁথা অম্লানপঙ্কজের বৈজয়ন্তীমালা। কোলাহলের হৃদয়েও অম্লান রয়েছে শুক্তিমতীর প্রতি ভালোবাসার প্রণয়পুষ্পটি।

কিছুদিন পরে রানী গিরিকা বাবার খোঁজ নিতে বাপের বাড়ি এসে দ্যাখেন কোলাহল পর্বতে আবার প্রাণের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটি ঝর্ণার নূপুরধ্বনি। নতুন একটি নদী সৃষ্টি হয়েছে, কোলাহল পর্বতের সর্ব অঙ্গ ঘিরে, জড়িয়ে, নেচে নেচে নামছে সেই তন্বী, স্বচ্ছ, ঝলমলে নদীটি, তার পরণে যেন হালকা মেঘের শাড়ি, তার জলে যেন অমৃতফলের মিষ্ট স্বাদ, আর সবচেয়ে আশ্চর্য তার স্রোতে আধো ফুটে রয়েছে একটি অম্লানপঙ্কজের কুঁড়ি। গিরিকাকে যেন নদীটি ডাকছে। এক অদৃশ্য টানে গিরিকা নদীর ধারে গিয়ে বসলেন। কুলুকুলু স্বরে তাঁকে ডেকে আদর করে নদী বলল, "এসেছিস মা? আয়, আমার কাছে বোস! তোর বাবাকে তো একেবারে ছেড়ে থাকতে

পারলাম না রে!"

সেই থেকেই মহাকায় কোলাহল পর্বতের প্রাণ ওই রূপসী শুক্তিমতী নদীটি। প্রতি পূর্ণিমারাত্রে জ্যোৎস্নায় অপ্সরী কিন্নরীরা এসে তারই স্রোতে জলকেলি করেন, আর তখন কোলাহল পর্বতের কোলাহল যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়!

প্রকাশকাল : ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

রূপবতীর বিয়ে

রূপবতী একে রাজকন্যে, তায় পরমা সুন্দরী, যেমন হয় রাজকন্যেরা। এদিকে তার বিয়ে আর হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কেন হচ্ছে না? বিয়ের বয়েস হয়েছে, দিগ্বিদিকে রাপুত্তুরেরও অভাব নেই। তবু রূপবতীর বিয়ে হয় না। সে বারান্দায় বসে বসে রূপটান মাখে আর টিয়াপাখিকে বোল পড়ায়। টিয়া বলে, "রূপবতী রাজকন্যের যুগ্যি বর এখনও জন্মায়নি!" শুনে রাজার চুল রাগে খাড়া-খাড়া, রানির চোখ রাগে গোল-গোল। রূপবতীর বিয়ে আর হবে কী করে? রূপ হলেই তো হয় না, মানুষটা কেমন দেখতে হবে তো? রূপবতী বড্ড অহঙ্কারী। রূপের বড়াই তার বড্ড বেশি। সেই ভয়ে জগতে হেন রাজা নেই, রাজপুত্তুর নেই, মন্ত্রীপুত্তুর নেই (এমনকী কোটালপুত্তুর কি সদাগরপুত্তুরেও রাজার আপত্তি ছিল না) যে রূপবতীকে বিয়ে করবে। "রাজকন্যা রূপবতী? ও বাবা! ও মেয়ের সঙ্গে ঘর করবে কে?" —এই বলে সবাই ছুটে পালায়। প্রথম-প্রথম বেশ কয়েকবার দিব্যি স্বয়ংবর সভা বসেছিল, রাজপুত্তুরের দল এসেওছিল, মালা নিয়ে রূপবতী সভাতে গিয়েওছিল। কিন্তু তার পরেই তো হয় কেলেঙ্কারি। রূপবতী সবাইকে ঠাট্টাতামাশা করে, কাউকেই ওর পছন্দ হয় না। মানী লোকেরা বারবার আসবে কেন তাদের মান হারাতে? স্বয়ংবর সভা ডাকলেও আর কেউ আসে না।

শেষকালে অনেক বলে কয়ে, চেষ্টাচরিত্র করে, রাজা একটা শেষবারের মতো স্বয়ংবর সভা ডাকলেন। তাতে পাঁচজন মাত্র রাজা সাহস করে এলেন (কেননা

রাজকুমারদের সাহসে কুলোল না) পাঁচ দেশ থেকে রথ ছুটিয়ে। রাজামশাই তাঁদের ফুলচন্দন দিয়ে, সানাই বাজিয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

রূপবতী সভায় ঢুকতেই যেন ঘরে বিদ্যুত-চমক খেলে গেল। সত্যি, সে বড় সুন্দর দেখতে। কিন্তু চলাফেরায়, চোখের চাউনিতে দম্ভ যেন ফেটে পড়ছে। সভায় ঢুকে রূপবতী একেকজন রাজার সামনে যাচ্ছে, আর ভুরু নাচিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে এক-একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। মালা নয়, বিদ্রূপই ছিল রাজাদের ভাগ্যে।

জয়পুরের রাজাটি নাদুসনুদুস, গোলগাল। তার সামনে গিয়ে রূপবতী বললে, "ও বাবা, এ যে তেলের পিপে!"

মণিপুরের রাজামশাই রোগা লম্বা, তাঁকে দেখে বললে, "আহাহা, যেন পাটকাঠি!"

রতনপুরের রাজার গাল দুটি একটু ফুলো মতন আছে, তাঁকে দেখে রূপবতী সখীদের বললে, "দ্যাখ, দ্যাখ, ফুলকো লুচি!"

কাঞ্চনপুরের রাজার রং একটু কালো, রূপবতী গালে হাত দিয়ে বললে, "বাপ রে! এ যে কালির দোয়াত!"

পলাশপুরের রাজা পরম রূপবান। রূপবতী তার কোনও ত্রুটিই খুঁজে পায় না, হঠাৎ দেখতে পেল মাথার ওপরে একটুখানি চুল বাতাসে উড়ে ঝুঁটির মতন হয়ে রয়েছে। রূপবতী অমনই হেসে গড়িয়ে পড়ল, "এটা যে একটা কাকাতুয়া রে!"

হাতের মালা হাতেই রইল। সখীদের সঙ্গে হাসাহাসি করতে করতে মল ঝুমঝুম, নূপুর রিনিঝিনি অহঙ্কারী পা ফেলে রূপবতী অন্তঃপুরে ফিরে গেল।

নিমন্ত্রিত রাজাদের মুখ লাল। রাগে, অপমানে তাঁদের মুখে বাক্য নেই। রূপবতীর বাবা তাঁদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন। মেয়ের আচরণে তিনি যারপরনাই লজ্জিত। তাঁর ভয় হল, অপমানিত হয়ে এই পাঁচটা রাজ্যের রাজা যদি এখন একজোট হয়ে তাঁকে আক্রমণ করেন? রাজারা খেপে গেছেন তাতে সন্দেহ নেই। ডেকে এনে অপমান করা হয়েছে তাঁদের। রাজামশাই ভয় পেলেন। আর রূপবতীর দায়িত্বহীন দুঃশীল আচরণের জন্যে তার ওপর ভয়ানক রাগ হল। এখন কী হবে? কিন্তু নাঃ, তেমন কিছু হল না। রাজকন্যে অসভ্যতা করলে কী হবে, অভ্যাগতরা ভদ্র। তাঁরা বললেন, "মহারাজ, রূপবতীর জন্যে বর জোগাড় করা আপনার কাজ নয়। ওটা ওঁকে নিজেই খুঁজে নিতে দিন।"

কিন্তু রাজামশাই রূপবতীর আচরণে এত লজ্জিত, এত বিরক্ত যে, রাগে

গরগর করতে করতে তিনি সভার মধ্যে ঘোষণা করলেন, (যেমন রাজারা বলে থাকেন আর কী) —"কাল ভোরে উঠে যার মুখ দেখব, তারই হাতে রূপবতীকে সঁপে দেব।"

অতিথি রাজারা প্রত্যেকেই হায়-হায় করে উঠলেন, রাজাকে অনেক বারণ করলেন এমন নিষ্ঠুর শপথ না নিতে। কিন্তু রাজার সেই এক গোঁ। মহারানি ঘরে গিয়ে দোর দিলেন। রূপবতীও শুনল, কিন্তু উচ্চবাচ্য করল না।

পরদিন ভোর হতে-না-হতে একটা মিষ্টি গানের সুর শুনে রাজার ঘুম ভেঙে গেল। রাজা বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখেন, নীচের রাস্তায় উমনোঝুমনো কাঁধ পর্যন্ত রুক্ষ জটা-পড়া চুল, একমুখ দাঁড়ি-গোঁফ, হাতে একতারা, পরনে তালি-মারা শতচ্ছিন্ন একটা আলখাল্লা-পরা একজন লোক ভারী চমৎকার গান করছে। সে ফকির না সন্ন্যাসী, না বাউল, না ভিখিরি, সে হিন্দু না মুসলমান, ছোকরা না বুড়ো, কিছুই বোঝবার উপায় নেই তাকে দেখে। গান শেষ করে আউলবাউল লোকটি রাজার কাছে হাত পাতল। রাজামশাই তাকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন। তারপর সেপাই পাঠিয়ে রাজপুরোহিতকে ধরে আনলেন মন্দির থেকে। সখীরা ভয়ে কাঠ। রানিমা অঝোরে কাঁদছেন। রাজামশাই সেই ভিখিরির হাতেই কন্যা সমর্পণ করলেন। তাঁর যেমন কথা তেমনই কাজ। এদিকে রাজকন্যা বিয়ে করে ভিখিরি কোথায় খুশি হবে, তা নয়। উলটে সে বললে, "আমি একারই খাবার জোটাতে পারি না, আবার বউকে খাওয়াব কেমন করে? নিজেরই থাকার ঠিক নেই, ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে জীবন, বউকে রাখব কোনখানে? এ আবার কীরকম ভিক্ষে দেওয়া?"

রাজা তখন ভিখিরির হাতে পাঁচটা সোনার মোহর দিয়ে বললেন, "এই নাও, এই দিয়ে যা পারো করো। এই ঢের! আর কখনও এখানে এসো না। তোমাদের কারও মুখদর্শন করতে চাই না আমি।"

রানিমা লুকিয়ে মেয়ের আঁচলে কিছু রাজভোগ পুঁটলি বেঁধে দিয়ে দিলেন। কে জানে মেয়ে কোথায় চলল। কবে আবার দেখা হবে। দেখা হবে কি হবে না। কী খাবে। কোথায় থাকবে। এত আহ্লাদে মানুষ!

রূপবতী তো রেগেই অস্থির। কিছুতেই যাবে না সে অচেনা আউলবাউল একটা ভিখিরির সঙ্গে, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে। কিন্তু ভিখিরির ব্যবহারটি খুব ভদ্র, আর গানের গলাটা সত্যি যেন জাদুঢালা। রাজকন্যা যখন দেখল রাজপ্রাসাদে সকলেই আশা করছে সে এই ভিখিরির সঙ্গে যেদিকে দু'চক্ষু যায় চলে যাবে, —তখন তারও আর ওখানে থাকতে ইচ্ছে করল না। কেউই তো বলল না, "রূপবতী,

যেয়ো না, থাকো।'' বলবে কেন? সবার সঙ্গেই যে তার তিরিক্ষি ব্যবহার। সুতরাং রাগে গরগর করতে-করতে রাজকুমারী রূপবতী অগত্যা ওই অচেনা আউলবাউল লোকটির হাত ধরে, পথে বেরোল। বর মানুষটা বেশ। রূপবতীর সঙ্গে বেশ সম্ভ্রম করে চলছে। ভিখিরির মতো পায়ের নীচে থেকেও কথা বলছে না, আবার 'স্বামী' বলে মিছিমিছি ওপর থেকে বিশ্রী সর্দারিও ফলাচ্ছে না। রূপবতীর দিকে নজর রেখেছে, যাতে কাঁকড়ে পা না পড়ে, কাদায় পা না পড়ে। শহর ছেড়ে বনের পথে কিছুটা হেঁটে, বর ওকে জিজ্ঞেস করলে, ''রাজকন্যে, তোমার কি ক্লান্তি লাগছে? এই তো একটা বুড়ো বট গাছ, তুমি এর ছায়ায় একটু বসবে?''

রাজকন্যের পা ব্যথা করছে, সে বসতে পেয়ে বেঁচে গেল। আঃ কী আরাম। ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে তার শরীর জুড়িয়ে গেল।

''এই প্রকাণ্ড বনটা কার? এত বিশাল-বিশাল ছায়াভরা গাছে ভর্তি?''

আউলবাউল বর বললে, ''ওই যে কালকে যে রাজাটা এসেছিল না, কাকাতুয়ার মতন ঝুঁটিওলা, এই বন তার।''

আর-একটু গিয়ে রাজকন্যে বললে, ''জল খাব, জল তেষ্টা পেয়েছে।''

পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছিল ঝিরঝির করে স্বচ্ছ সুন্দর একটা নদী, সেখান থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে রূপবতী বললে, ''আঃ! কী সুন্দর মিষ্টি জল। এই ঝরনা কোথা থেকে আসছে?''

''ওই কাকাতুয়া রাজার রাজ্য থেকে।''

ঘন বন থেকে বেরিয়ে এসে পড়লে সবুজ গরু চরানোর মাঠে, সেখানে স্বাস্থ্যবান সব গরু চরে বেড়াচ্ছে। তারপর সোনালি ঢেউখেলানো ধানখেত। খেত পেরোতে না পেরোতে আমবাগান, লিচুবাগান, কলাবাগান, ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে গাছ। তারপর দিঘি, তালবন, নারকেল বাগান—লক্ষ্মীশ্রী উপচে পড়ছে এমন সুন্দর-সুন্দর সব গ্রাম। তকতকে নিকোনো উঠোনে ধানের গোলা, ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। তারপর এত মস্ত এক নদী, তাতে কী বড়-বড় বাণিজ্যের নৌকো। মস্ত-মস্ত হাট বাজার। যতই যা দ্যাখে রূপবতী বলে, ''বাউল, এইসব কি আমার বাবার রাজ্য?''

বাউল হাসে। বলে, ''না, রূপবতী, সে তো অনেকক্ষণ ছেড়ে এসেছি। এসব সেই কাকাতুয়া রাজার রাজত্ব!''

শেষকালে তারা এসে পৌঁছল বিরাট এক নগরে। দেখেই বোঝা যায় প্রজারা খুব সুখে-শান্তিতে আছে। সুন্দর-সুন্দর বাগান-ঘেরা বাড়ি, পরিচ্ছন্ন দোকানপাট, মন্দির, মসজিদ, গির্জে। শহরের মধ্যিখান দিয়ে ঝরঝর করে সেই নদীটা বয়ে

যাচ্ছে, তাতে রংচঙে রামধনুর মতন সব সেতু। গাড়ি-ঘোড়া সব ঝকঝকে, রাস্তাঘাট সব ধোয়ামোছা, তকতকে। দু'ধারে ছায়াভরা গাছ। "এই সুন্দর শহরটা কার?"

"এ সেই কাকাতুয়ার রাজধানী।"

একটা মার্বেল পাথরের প্রাসাদ এল, যেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতন সুন্দর। "এখানে কে থাকে?"

"ওই কাকাতুয়া রাজা।"

বেচারি রূপবতী এবার বলেই ফেললে, "আউলবাউল, আমি খুব ভুল করেছি। রাজাটাকে আসলে দেখতে চমৎকার ছিল, আমি শুধু-শুধুই ওকে ঠাট্টা করেছি। বুদ্ধি থাকলে আজ তোমার মতন ভিখিরির বউ না হয়ে এই প্রাসাদের রাজরানি হতে পারতুম।"

উত্তরে বাউল বেচারি আর কী বলবে? তার কাছে তো সত্যি রূপবতী কোনও দম্ভ প্রকাশ করেনি। সে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে-হাঁটতে শহরের ধারে একটা ছোট ভাঙামতন পাতার কুটিরের সামনে এসে পড়ল ওরা। রূপবতী বললে, "এই ভাঙা কুঁড়ে ঘরে কে থাকে?"

"এখানেই তো আমি থাকি। তুমিও এখানে থাকবে," বলল রূপবতীর বর। "আজ থেকে এটা তোমারও বাড়ি।" দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে মিষ্টি করে হেসে, মিষ্টি গলায় "এসো" বলে রাজকন্যের দুটি হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল ভিখিরি-বর।

রূপবতী আর কী করে? জীবনে কোনওদিন সে মাটির ঘরে পা দেয়নি, পাতার চালা দ্যাখেনি। খিদে পেয়েছে। ঘুম পেয়েছে। ক্লান্তিতে শরীর নুয়ে পড়ছে। মায়ের দেওয়া রাজভোগ যা পুঁটলিতে ছিল দু'জনে মিলে ভাগ করে তাই খেল। সে তো শখের খাবার। তাতে কি পেট ভরে? রূপবতী চেয়ে-চেয়ে দেখলে মাটির মেঝে মাটির দেওয়াল, এককোণে একটা মাটির প্রদীপ। রাজবাড়িতে তার ছিল মর্মরের মেঝে, স্ফটিকের দেওয়াল, সোনার প্রদীপ। রুপোলি পালঙ্কে রেশমের শয্যা। এখানে একটা মাদুর গুটোনো ছিল।

বাউল যত্ন করে সেইটে বিছিয়ে দিলে। বললে, "নাও, রূপবতী, শুয়ে পড়ো।"

বাসন বলতে একটা মাটির হাঁড়ি, একটা মাটির থালা আর একটা মাটির গেলাস। ভিক্ষে করে যেদিন যা পায় বাউল সেইটে ফুটিয়ে নেয়। কুটিরের সামনে ছোট উঠোনে তিনটে ইঁট পাতা আছে, সেটাই উনুন। আজ তো সঙ্গে ভিক্ষে বলতে আস্ত একটি রাজকন্যে আর পাঁচটা মোহর। কোনওটাই ফুটিয়ে খাওয়া

যাবে না। বাউল বেরোল বাজার করতে। চাল-ডাল, আলু-পেঁয়াজ, তেল-নুন নিয়ে এসে রাজকন্যেকে বললে, "ওঠো, দেখে নাও কেমন করে উনুন ধরাতে হয়, কাঠকুটো, শুকনো পাতা দিয়ে।"

উনুন ধরিয়ে বাউল নিজেই খিচুড়ি চাপিয়ে দিলে। "রূপবতী, শিখে নাও, কেমন করে খিচুড়ি রাঁধতে হয়। মাঝে-মাঝে আমি রাঁধব আর মাঝে-মাঝে তুমি।"

রূপবতীর চোখ দিয়ে ঝরঝরিয়ে জল পড়ছে। একে তো কাঠকুটোর ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে। তায় পেঁয়াজ কুটে চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। সবার ওপরে, মনের দুঃখের অশ্রু তো ঝরছেই। খিচুড়ি রান্না হল, এক থালা থেকে ভাগ করে দুজনে যখন খেল, খিদের মুখে সেটা রাজবাড়ির পোলাওয়ের চেয়ে কম সুস্বাদু লাগল না রূপবতীর। এক গেলাস জল খেয়ে, এক মাদুরে শুয়ে, রূপবতী রাজকন্যা কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমন্ত রূপবতীকে দেখলে কে বলবে সে অত অহঙ্কারী, অত রাগী? আহা, যেন মোমের পুতুলটি! কেবল চোখের কোণে জলটুকু দেখলেই বোঝা যায়, মোম নয়, মানুষ।

সকালে উঠে বাউল কোথা থেকে একগোছা বেত নিয়ে এসে জলের মধ্যে ভিজিয়ে দিলে। বললে, "বউ, আমি তো গান গেয়ে ভিক্ষে করে দু'জনের মতন রোজগার করতে পারি না, তোমাকেও কিছু করতে হবে। তুমি বরং বাড়িতে বসে বেতের ঝুড়ি-চুপড়ি বোনো। বেচে দুটো পয়সা আসবে, তোমার একটু আরাম হবে।"

"ঝুড়ি?" রূপবতী তো আকাশ থেকে পড়ল।

"আমি কেমন করে ঝুড়ি বুনব? ওসব কি আমি জানি?"

বাউল বললে, "কিছু ভাবনা নেই, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।" কেবল ভাল গানই করে না, দিব্যি ভাল ঝুড়ি বুনতে পারে রূপবতীর বর। কিন্তু শেখালে কী হবে রাজকন্যে বেত নোয়াতেই পারে না। ছুলতেও পারে না। তার হাতে কড়া পড়ছে, তার চামড়া উঠে যাচ্ছে। বেতের ঝুড়ি বোনা রূপবতীর দ্বারা হল না।

বরের স্বভাবটি সত্যি ভাল।

রূপবতী তো কোনওদিন রান্নাঘরে যায়নি, রাঁধতে-বাড়তে শেখেনি। সে কোনওদিন সেলাই করেনি। কোনওদিন কিছুই করেনি সংসারের। ব্যাপারটা তার বর বুঝতে পারে। তাকে চাপ দেয় না। নিজেই রান্নাবান্না সেরে ফেলে। রূপবতীকে কিছু বলে না। শুধু একদিন তার ছেঁড়া আলখাল্লাটা রূপবতীকে বললে একটু সেলাই করে দিতে, সে তখন রান্না করছে। রূপবতী তো আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্তারক্তি করে বসে রইল। বাউল তাড়াতাড়ি গাঁদাফুলের পাতা

চিবিয়ে তার রস চিপে দিয়ে, রাজকন্যের আঙুলের রক্ত আর চোখের জল বন্ধ করলে। রূপবতী কিছুই জানে না, কিছুই পারে না। রূপবতী পড়ে-পড়ে ঘুমোয়। আর মাঝে-মাঝে কাঁদে, আর চারদিকে চেয়ে দ্যাখে। চাষী সারাদিন চাষ করছে রোদে, কামার লোহা পেটাচ্ছে গরমের মধ্যে, ফেরিওলা ফিরি করে বেড়াচ্ছে ভরদুপুরে, কেউই বসে নেই। কেউ বিনা কাজে থাকে না। দেখে-দেখে একদিন সে নিজেই বললে, "বাউল, আমি কিছু কাজ করতে চাই।"

বাউল তো খুব খুশি। তক্ষুনি একঝুড়ি মাটির বাসন কিনে এনে বউকে বললে, "চলো, তোমাকে হাটে বসিয়ে দিয়ে আসি। তুমি এগুলো বিক্রি করো বসে-বসে।"

বেলা দুপুরের আগেই তার সব জিনিস বিক্রি হয়ে গেল। রূপবতীর রূপ যেন দুঃখে-কষ্টে আরও খুলেছে। মন খারাপ, মুখ ভার। মুখে একটুও হাসি নেই, তবু সব কিছু হুড়মুড় করে বিক্রি হয়ে গেল। বাউল তো খুব খুশি। একবারই কেবল রূপবতী তার আগেকার অহঙ্কারী স্বভাবটা প্রকাশ করে ফেলেছিল, একটা ষণ্ডাগুণ্ডা মতন লোক এসে ওকে বিরক্ত করছিল, রূপবতী দিয়েছে তাকে একটা থাপ্পড় কষিয়ে।

পরদিন আবার হাটে বসেছে মাটির বাসন নিয়ে রূপসী রূপবতী। আবার বিক্রিবাটা শুরু হয়েছে পুরোদমে। হঠাৎ হল কী, কোত্থেকে একটা মাতাল ঘোড়সওয়ার এসে তার বাসনকোসনের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। রূপবতী হাহাকার করে উঠল। তার এত কষ্টের বাসনগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। কিন্তু কাকে ধরবে? কাকে বকবে? সেপাই তো ঘোড়াসুদ্ধু হাওয়া। ভাঙা জিনিস তো আর জোড়া লাগবে না। রূপবতী চোখভরা জল নিয়ে কুটিরে ফিরল। বাউল বললে, "নাঃ, হাটে বসাটা তোমার পক্ষে ঠিক নয়। তুমি বড্ড রূপসী। দুষ্টু লোকে তোমাকে বিরক্ত করবেই। তার চেয়ে বরং রাজবাড়ির রাঁধুনি বামুন আমার বন্ধুমানুষ। তাকে বলে দেখি, যদি রাজবাড়ির পাকশালাতে তোমাকে ঢোকাতে পারে।"

বেচারি রাজকন্যে রূপবতী। জীবনে কখনও সে নিজের প্রাসাদের পাকশালে ঢোকেনি, তাকে কিনা অন্যের বাড়ির রান্নাঘরে দাসীবৃত্তি করতে হবে?

রাঁধুনি মানুষটি বড় ভাল। রূপবতীকে দেখেই বুঝেছে তার কাজকর্মের অভ্যাস নেই। তাই ওকে সামান্য ফাইফরমাশ করা ছাড়া শক্ত কাজ দিত না। রাজার রান্নাঘরে তো জোগাড়ের অভাব নেই?

রোজ রাত্রে বাড়ি ফেরার সময়ে রাঁধুনি রূপবতীর আঁচলে কিছু খাবারদাবার

বেঁধে দিত বাউলের জন্যে। এই ক'দিনে রূপবতীরও বাউলের ওপর বেশ মায়া পড়ে গেছে। লোকটা মানুষ ভাল।

হপ্তাখানেক বাদে, একদিন রূপবতীর দ্যাখে শহরসুদ্ধু সরগরম। মোড়ে-মোড়ে তোড়ণ বাঁধা হচ্ছে, পতাকা ওড়ানো হচ্ছে, রাজবাড়ি ধোয়ামোছা, সোনারুপো পালিশ হচ্ছে, মন্ত্রীমশাই খুব ব্যস্ত, দারুণ উত্তেজনা চারদিকে। কী? না মহারাজার বিয়ে। তারই প্রস্তুতি চলছে। সারা শহর শুধু নয়, সারাটা রাজ্য যেন মেতে উঠেছে।

রাজপ্রাসাদে তো উত্তেজনার শেষ নেই, উঠোনে ভিয়েন বসেছে, সুগন্ধে বাতাস 'ম' 'ম' করছে। সন্ধ্যায় কাজের পরে রূপবতী যখন বাড়িতে ফিরছে বুড়ো রাঁধুনি যথানিয়মে তার কোঁচড় ভরে দিল ভিয়েনের মণ্ডামিঠাই দিয়ে। "বরের জন্যে নিয়ে যাও।" বেরোবার মুখে রাঁধুনি বুড়ো ডেকে বললে, "যাবে নাকি প্রাসাদে? চলো একবার দেখে আসি কেমন প্রস্তুতি চলছে?"

রূপবতীরও খুব কৌতূহল হচ্ছিল। তা ছাড়া প্রাসাদের ভেতরটা সে তো কোনওদিন দ্যাখেইনি। এ-ঘরে ও-ঘরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যা কিছু দেখছে তাতেই মুগ্ধ দু'জনে। অবশেষে নাচঘরে কিছু হচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে যেই না দরজায় হাত রাখা, অমনই সেটি খুলে বেরিয়ে এলেন—কে? না রাজামশাই স্বয়ং। রূপবতীকে দেখে বললেন, "এটি আবার কে? একে তো দেখিনি?"

রাঁধুনি বামুন বললে, "এটি আমাদের নতুন জোগাড়ে। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। যাও রাজামশাইকে পেন্নাম করো।" —রূপবতী লজ্জায় মরে যাচ্ছে। এ তো সেই কাকাতুয়া রাজা! যাকে মিছিমিছি অপমান করেছিল।

রূপবতীর অহঙ্কার আর নেই, কিন্তু অভ্যেসটা থেকে গেছে। রাজার মেয়ে সে, বাইরের লোককে প্রণাম করতে শেখেনি। যেই না দুই হাত তুলে নমস্কার করতে গেছে রাজাকে অমনই তার কোঁচড় থেকে রাজ্যের মণ্ডামিঠাই ঝরঝর করে মর্মরের মেঝেয় ঝরে পড়ে গেল। আর ঘরসুদ্ধু লোকজন হো-হো করে হেসে উঠল। "লুকিয়ে-লুকিয়ে খাবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বাড়িতে? এইবার ধরা পড়ে গেছে।"

রূপবতী লজ্জায় অপমানে অস্থির হয়ে চোখের জল চাপতে-চাপতে দরজার দিকে ছুট লাগাল।

কিন্তু পালাবে কোথায়? রাজামশাই নিজে এসে তাকে পাকড়ে ফেললেন। হাত দুটি ধরে মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "কী গো, রূপবতী রাজকন্যে, কোথায় পালাচ্ছ তোমার নিজের বাড়ি ছেড়ে?"

রূপবতী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে রাজামশাই মুকুট খুলে ফেললেন,

হেসে বললেন, "আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো তো চিনতে পারো কিনা? আমিই তোমার আউলবাউল বর, আর সেই ষণ্ডাগুণ্ডা লোকটা, যাকে তুমি এক থাপ্পড় লাগালে, আর সেই মাতাল ঘোড়সওয়ার। এবার চিনেছ?"

তারপরে আর কী? রাজবাড়ির রোশনচৌকিতে খুশির সানাই বেজে উঠল। রূপবতীর পুরনো সখীর দল হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এল, হাত ধরে তাকে কনে সাজাতে নিয়ে গেল। আজ রূপবতীর বিয়ে। চন্দনে, রূপটানে, ময়ূরকণ্ঠী রেশমি জামদানিতে, চোখে জল, ঠোঁটে হাসি রূপবতী সাজতে-সাজতে হঠাৎ জানলা দিয়ে দ্যাখে নীচে কে? রাজামশাই আর রানিমা সেজেগুজে সপ্তঘোড়ার রথ থেকে নামছেন, মুখে হাসি আর ধরে না!

(একটি আইরিশ উপকথার ছায়া অবলম্বনে)

প্রকাশকাল : ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

বুদ্ধি বেচার সওদাগর

এক নাপিতের মনে খুব দুঃখু। তার ছেলেটা কেবলই খেলে বেড়ায়, কেবলই খেলে বেড়ায়, কাজকর্ম কিছু করে না। সে নাপিতগিরি করতে চায় না। তার ওই ক্ষুর কাঁচি সাবান ফিটকিরি এ-সব ভালোই লাগে না।

'তবে তুই কী হবি?'

'আমি কিচ্ছু হবো না।'

'কিচ্ছু হবি না তো খাবি কী?'

'আমি কিচ্ছু খাবো না' তো বলা যাবে না। নাপিতের ছেলের ভারি মুশকিল হলো। সে তবু বলল, 'হাওয়া খাবো।'

'হাওয়া খেয়েই বাঁচবি?'

'মানুষ তো হাওয়া খেয়েই বাঁচে, বাবা! হাওয়া বন্ধ করলে আমরা বাঁচব?'

'নাঃ, তোর সঙ্গে কথায় আমি পারি না। তুই বকতিয়ারী করেই খাবি।'

শুনেই নাপিতের ছেলে নেচে উঠল।

'পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি! আমি কী হবো, তার সমাধান পেয়ে গেছি। থ্যাংকিউ।'

নাপিত তো অবাক!

'কী আবার পেলি?'

'ওই যে তুমি বললে, বকতিয়ারী করেই খাবি? ঠিক তাই করব। কথা বেচে খাবো।'

'সে তো উকিল মোক্তারের কাজ। কথা বেচে খায় তারা। তুই কি আইন

পড়েছিস?'

'আমি তো আদালতে যাবো না। আমি যাবো হাটে। হাটের মাঝখানে একটা দোকান দেবো। সেই দোকানে কথার বেচা-কেনা হবে।'

নাপিত বড় বড় চোখ করে বললে, 'সত্যি বাপু! তুই কোনওদিন বড় হলি না। খালি খেলা-খেলা। খালি খেলা-খেলা।'

'খেলা নয় বাবা, সত্যি! দেখো তুমি।'

পরের হপ্তায় হাটে দেখা গেল ছোট একটা খড়ের চালা আর বাঁশের মাচা বেঁধে দিব্যি নাপিতের ছেলেটি দোকান দিয়েছে। তাতে মস্ত সাইনবোর্ডে লেখা : 'এখানে সুবুদ্ধি বিক্রয় করা হয়।'

সুবুদ্ধির আবার বিক্রিবাটা কী? হাটের লোক তো হেসেই বাঁচে না। ছেলেটার কেবল ইয়ার্কি-ঠাট্টা!

এদিকে হয়েছে কী, ওপাশের গাঁয়ের জমিদারের ছেলেটি এক সদাগর-কন্যাকে বিয়ে করতে চেয়ে পাগল। কিন্তু সেই মেয়ে একটি টাকা দিয়ে তাকে বলেছে —বাজার থেকে আগে কিছু খাদ্য, কিছু পানীয়, বাগানে পোঁতার জন্যে কিছু বীজ, আর গরুর খাবার—এই চারটে জিনিস কিনে আনতে। ছেলেটা দেখছে এক টাকাতে মোটে একটাই কিছু হতে পারে বড়জোর। চার রকম কেন, দু'রকম জিনিসও হয় না। সে তো জমিদারের ছেলে, আগে কখনও বাজারে যায়নি, তাই জানত না। হাটে এসে সে বেচারি খুব মুশকিলে পড়েছে। কাঁদো-কাঁদো মুখে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নাপিতের ছেলের সাইনবোর্ড দেখে, সে ভারি খুশি। এসে বললে, 'আমি সুবুদ্ধি কিনব।'

'কিন্তু দু'টাকা দিতে হবে।'

'তা দেবো। আগে আমার সমস্যার সমাধান করে দাও। এক টাকাতে চার রকমের জিনিস যদি না কিনতে পারি, সদাগর-কন্যে আমাকে বিয়ে করবে না বলেছে। আর ও যদি আমাকে বিয়ে না করে, আমি তাহলে প্রাণে বাঁচব না। আর আমি যদি মরে যাই, আমার মা-ও বাঁচবেন না। আর মা যদি মরে যান, তবে বাবাও—'

'আহা, থামো থামো। কেউ মরবে না, বিয়েও হবে। বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করে, ভাল করে খাওয়াবে তো?

'আগে তো সমাধান—'

'একটা তরমুজ কিনে নিয়ে যাও। শাঁসটা খাদ্য, জলটা পানীয়, বিচিগুলো বীজ আর খোসাটা গরুর খাবার। এই তো সহজ ব্যাপার। এক টাকাতেই চার

রকম!'

জমিদার পুত্তুর আহ্লাদে আটখানা হয়ে, তাকে দুইয়ের বদলে দশটাকা দিলো। তরমুজটি কিনে নিয়ে, নাচতে নাচতে বাড়ি গেল।

নাপিতের ছেলে বাড়ি এসে বাবাকে দশ টাকা দিলে। নাপিত অবাক!

'কী করে পেলি?'

'বুদ্ধি বেচে!'

নাপিতরা খুব বুদ্ধিমান হয়, এমন একটা কথা আছে বটে। নাপিতের বুদ্ধি নিয়ে অনেক গল্পও আছে, তা নাপিতও জানে। কিন্তু সত্যি-মিথ্যে প্রমাণ পায়নি। সে নিজে, তার বাবা, কেউই ধূর্ত নয়। খেটে-খুটে রোজগার করে তারা। এই ছেলেই নাপিত-বংশের নাম রাখলে!

এদিকে হাটের লোকে তো খাবার জিনিস কেনে, পরার জিনিস কেনে, ব্যবহার করবার জিনিস কেনে, যা দেখা যায় না, ধরা যায় না, যার গন্ধ নেই, যাকে ছোঁয়া যায় না—এমন জিনিস তো কেউ কিনতে আসে না। বুদ্ধি তেমনি জিনিস।

এক বামুনের এক বোকা ছেলে ছিল। সে ওখান দিয়ে যেতে যেতে দোকানের নাম দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বুদ্ধি কেমন করে কিনতে হয়, সে তো জানে না।

বামুনের ছেলে বললে, 'আমাকে আড়াইশো গ্রাম বুদ্ধি দাও।'

নাপিতের ছেলে বললে, 'আমি তো বুদ্ধি ওজনে বেচি না, মাপে বেচি। তুমি ক'পয়সার বুদ্ধি চাও?'

বামুনের ছেলে বললে, 'পঞ্চাশ পয়সার।' বলে একটা আধুলি দিলে।

তখন নাপিতের ছেলে একটা কাগজে তাকে লিখে দিলো —'যখন দু'জন লোকে মারামারি করছে কখনও সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে নেই।'

বামুনের ছেলে সেটি পকেটে পুরে বাড়িতে নিয়ে এসে, বাবাকে দেখাতে গেল।

'বাবা, তুমি বলো আমাকে, আমার নাকি বুদ্ধি নেই। তাই আজ আট আনার বুদ্ধি কিনেছি।'

বামুন বললে, 'তার মানে?'

ছেলে কাগজটা বাবার হাতে দিলে।

বামুন তো চটে লাল।

'কে না জানে মারামারি করলে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে নেই? তার জন্যে পঞ্চাশ পয়সা? চল্ দেখি, তোর বুদ্ধিওলা কে। ঠকিয়েছে তোকে।'

নাপিতের ছেলেকে গিয়ে বামুন বললে, 'লোক ঠকাবার জায়গা পাওনি? দাও শিন্নির পঞ্চাশ পয়সা ফেরৎ।'

নাপিতের ছেলের নাম মন্টু। মন্টু বললে, 'টাকা নিশ্চয়ই ফেরৎ দেবো, আপনি আমার মাল ফেরৎ দিন।'

বামুন কাগজের টুকরোটা ছুঁড়ে দিলো।

মন্টু বললে, 'এটা তো কাগজ। এটা তো সুবুদ্ধি নয়। আমার সুবুদ্ধিটা ফেরৎ দিতে হলে, আপনাকে উল্টে আমাকে একটা কাগজ দিতে হবে সই করে এই লিখে, যে —আমার ছেলে কখনও এই বুদ্ধি ব্যবহার করবে না। দু'জন লোকে মারামারি করলে, সে দাঁড়িয়ে দেখবে।'

হাটের লোকেও এবার মন্টুর পক্ষ নিলে। বামুন রেগে-মেগে কাগজে ওই কথা লিখে, দস্তখত্ করে দিলে আর পঞ্চাশ পয়সা ফেরত নিয়ে চলে গেল।

সেই রাজ্যের রাজার ছিল দুই রানী। আর দু'জনের ভয়ানক ঝগড়া। রানীদের আবার ছিল দুই দাসী। দাসীদের মধ্যে আরও বেশি ঝগড়া। ওফ্, তারা তাদের মনিবানীদের চেয়েও অনেক বেশি ঝগড়া করে। কী তাদের রেষারেষি!

সেদিন দুই দাসী হাটে এসেছে। এক চাষীর কাছে চমৎকার একটি পাকা কুমড়ো দেখে, দুজনেই সেটা কিনতে চাইল। চাষী বেচারি পড়ল মুশকিলে। দুই দাসীর ঝগড়া এমন পর্যায়ে উঠল, যে তাদের চ্যাঁচামেচি হট্টগোলের চোটে হাটের কুকুর-বেড়ালেরা দৌড়ে পালিয়ে গেল। আর তাদের মুখের ভাষা শুনে চাষী বেচারি নিজেই ছুটে পালাল কুমড়ো-টুমড়ো ফেলে।

বামুনের বোকা ছেলেটি দেখলে এখানে মারামারি বাধতে চলেছে। বাবার সঙ্গে মন্টুর বন্দোবস্ত অনুযায়ী সে গেল মারামারি দেখতে। দাসীরা তো চুলোচুলি করল, হাতাহাতি করল। এ ওর কাপড় ছিঁড়ে দিলো। তারপর দু'জনেই কাঁদতে কাঁদতে বামুনের ছেলেকে বললে, 'বামুনদাদা, আপনি তো দেখলেন, ও আমাকে আগে মেরেছে। আপনি সাক্ষী রইলেন।' বলে তারা পুকুরে মুখ-চোখ ধুয়ে, কাপড় ঝেড়ে-ঝুড়ে, অন্য কাজে চলে গেল। বামুনের ছেলেও বাড়ির পথে হাঁটা দিলো।

দাসীরা করেছে কী, প্রাসাদে ফিরে যে যার রানীমাকে নালিশ জানিয়েছে। আর দু'জনেই বলেছে বামুনের ছেলেটা সাক্ষী, অন্যজন আগে তাকে মেরেছিল। আরও কত কী বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিছিমিছি বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

শুনে দুই রানীমা ক্ষেপে লাল। তাঁরা রাজার কাছে নালিশ জানালেন। আর দু'জনেই সেই বামুনের বাড়িতে দূত পাঠালেন, তার ছেলেকে সাক্ষী দিতে হুকুম করে। বড়রানীমাও। ছোটরানীমাও। যদি সে বড়রানীর পক্ষে সাক্ষী দেয়, তবে

ছোটরানীমা তার গর্দান নেবেন। আর যদি ছোটর পক্ষে সাক্ষী দেয়, তবে বড়রানীমা তাকে শূলে চড়াবেন।

বামুন আর বামুনের ছেলে তো ভয়ে কাঁটা! এবারে ছেলের প্রাণ যাবেই। আর রক্ষে নেই। শেষকালে ছেলে বললে, 'বাবা, আমি বরং সেই দোকানে যাই। কিছু সুবুদ্ধি কিনে আনি। ওর বুদ্ধিটা ফেরৎ না দিলে, আমার এই দশা হোত না। দেখি, যদি ও আমাকে বাঁচাতে পারে।'

সন্ধ্যেবেলা, তখন হাট উঠে যাচ্ছে, মন্টুও ঝাঁপ ফেলে বাড়ি যাচ্ছে, বামুনের ছেলে আর বামুন এসে তার কাছে বুদ্ধি কিনতে চাইল।

'বড় বিপদ! রক্ষা করো ভাই।'

মন্টু বললে, 'পাঁচশো টাকা লাগবে। এটা দামী বুদ্ধি।'

বামুন পাঁচশো টাকা দিলে।

মন্টু বললে, 'রাজসভাতে গিয়ে পাগলের অভিনয় করবে। এমন ভান করবে, যেন কারুর কোনও কথাই তুমি বুঝতে পারছো না।'

পরদিন রাজা তো সাক্ষীকে সভায় ডেকে পাঠালেন। বামুনের ছেলেকে মন্ত্রী অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ছেলেটা আবোল-তাবোল কথা বলল, হাসল, গান গাইল। কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিলো না। রাজামশাই চটে-মটে, অধৈর্য হয়ে, তাকে সভা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মুক্তি পেয়ে, প্রাণ ফিরে পেয়ে, বামুনের ছেলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে, মহানন্দে সব্বাইকে মন্টুর বুদ্ধির কথা বলে বেড়ালে। হাটের লোকজনও মন্টুর 'সুবুদ্ধির দোকানের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

·

বামুনের কিন্তু মনে শান্তি নেই। একেই বোকা ছেলে, তায় তাকে এখন সারা জীবন পাগলের অভিনয় করে যেতে হবে। নইলে রাজা জানতে পারবেন —তাঁকে ঠকানো হয়েছে। ব্যস্! কচাৎ করে মুণ্ডু খসে যাবে।

কোনও উপায় ভেবে বের করতে না পেরে, বামুন হাটের দিনে আবার মন্টুর দোকানে গেলো বুদ্ধি কিনতে।

মন্টু বললে, 'পাঁচশো টাকা আগে দাও। তারপর বলছি।'

টাকা নিয়ে সে বুদ্ধি দিলে, 'যখন রাজার মেজাজ প্রসন্ন থাকবে, তখন তাঁর কাছে ফিরে যাও। হাট থেকে শুরু করে সব সত্যি ঘটনা তাঁকে খুলে বলো। তিনি হেসে ফেলবেন। তোমাকে মাপও করে দেবেন।'

বামুন তক্কে-তক্কে থাকে। একদিন খবর এলো রাজা খুব খোশ-মেজাজে আছেন, বড়রানীমার ছেলে হয়েছে। তাড়াতাড়ি বামুন তার ছেলেকে নিয়ে সভায়

গেলো। আর সেই পঞ্চাশ পয়সার বুদ্ধি কেনা থেকে শুরু করে, সব গল্পটা বলে দিলে রাজাকে। শুনে রাজা যত হাসেন, মন্ত্রীও তত হাসেন, সভাসদ্‌রাও তত হাসেন। হাসির হর্‌রা পড়ে গেল রাজবাড়িতে। পাইক-বরকন্দাজরাও হাসতে লাগল।

রাজা বামুনের ছেলেকে মাপ করে দিলেন। মন্ত্রীকে তিনি বললেন, 'নাপিতের ছেলেটিকে সভাতে ডেকে আনো তো। দেখি, তার কাছে আর কী কী সুবুদ্ধি আছে বেচবার মতন।'

মন্টু এসে রাজাকে প্রণাম করল।

রাজামশাই বললেন, 'বলো দেখি বাছা, তোমার কাছে আর কী কী সুবুদ্ধি আছে?'

মন্টু বিনীতভাবে উত্তর দেয়, 'তা, আছে প্রচুর। বিশেষ করে রাজামশাইয়ের কাজে লাগবার মতন অনেক সুবুদ্ধি আছে। কিন্তু তার অনেক দাম। এক লক্ষ টাকা। মানে, মোট একশো হাজার টাকা।'

রাজা তক্ষুনি কোষাগার থেকে এক লক্ষ টাকা আনিয়ে, মখমলের থলেতে পুরে মন্টুকে দিয়ে দিলেন। মন্টুও তখন তাঁর হাতে একটা খাম দিলো। খাম খুলে রাজা দেখেন—তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে : 'কোনও কাজ করবার আগে গভীর ভাবে চিন্তা করে নেবেন।'

সুবুদ্ধিটি পেয়ে রাজামশাই খুব খুশি হলেন। বড় বড় করে লিখে, বাঁধিয়ে, টাঙিয়ে রাখলেন ঘরে। যাতে কখনও ভুলে না যান, তাই বালিশের ওয়াড়ে, জলের গেলাসের গায়ে, সর্বত্রই এটা লিখে রাখলেন। আর ভেবে-চিন্তে কাজ করতে থাকলেন।

কিছুকাল পরে রাজামশাইয়ের ভীষণ অসুখ করল। ছোটরানী আর মন্ত্রীমশাই ষড়যন্ত্র করলেন—এই বেলা রাজাকে মেরে ফেলতে হবে। তারপর বড়রানীকে আর তাঁর ছেলেকে শূলে চড়িয়ে, রাজ্য শাসন করবেন ছোটরানী আর মন্ত্রী। এই ভেবে তাঁরা রাজার ওষুধের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেবার জন্যে কবিরাজমশাইকে অনেক টাকা ঘুষ দিলেন।

কবিরাজমশাই তো লোভে পড়ে ওষুধে বিষ মিশিয়েছেন। রাজামশাই ওষুধ খাবার জন্যে যেই গেলাসটি মুখে তুলেছেন, তাঁর হঠাৎ চোখে পড়ল —'কোনও কাজ করবার আগে গভীরভাবে চিন্তা করে নেবেন।'

লেখাটি দেখে রাজার সেই গল্প, সেই বামুনের বোকা ছেলেটির কথা মনে পড়ল। তিনি মৃদু হাসলেন। এদিকে কবিরাজ তো অন্যায় কাজ করে আপন

মনেই ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলেন, এখন রাজার মুখের মৃদু হাসিটি দেখামাত্র তাঁর মনে আর সন্দেহ রইল না যে—রাজামশাই ঠিক বুঝতে পেরেছেন ওষুধে বিষ! তিনি গেলাস কেড়ে নিয়ে, সাষ্টাঙ্গে রাজার পায়ে আছড়ে পড়ে মাপ চাইলেন।

রাজা প্রথমে অবাক হলেও, সবই বুঝলেন। দুষ্টু মন্ত্রী আর ছোটরানীকে হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার মতন এত বিচ্ছিরি জিনিস তো আর হয় না! কবিরাজমশাই মাপ চেয়েছেন বলে, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে দ্বীপান্তরে পাঠানো হোল।

আর মন্টুর কাছে দূত গেলো। নাপিত দরজা খুলে দ্যাখে রাজার পেয়াদা এসেছে।

'কী ব্যাপার?' নাপিত তো ভয়ে কাঠ। 'তখনই বলেছিলুম! রাজার কাছেও কিনা চালাকি! নাও, এবারে তবে সবাই মিলে জেলে যাই!'

বাবাকে শান্ত করে, পেয়াদার হাত থেকে চিঠি নিয়ে মন্টু দেখল—রাজা তাকে মন্ত্রীর পদে নির্বাচন করেছেন। আজ থেকেই সে রাজার প্রধানমন্ত্রী!

আর কী? তখন নাপিতের আহ্লাদ দেখে কে!

নাপিতের ছেলে মন্টুর
দোকান ছিলো বুদ্ধির।
রাজ্যিসুদ্দু তোলপাড়
মন্টু কেবল সুস্থির।।

(গুজরাতী লোককথা অবলম্বনে)

প্রকাশকাল : ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

টাপুর, টুপুর আর বনদেবী

এক বিশাল অরণ্যে, একটা ঝিরঝিরে নদীর ধারে, টাপুর আর তার বউ টুপুর কুটির বেঁধে বাস করত। দু'জনে খুব ভাব, গাছের ফল খেয়ে, মাটি থেকে মূল খেয়ে, হরিণ মায়ের দুধ খেয়ে, পদ্মফুলের মধু খেয়ে টাপুর আর টুপুর আপনমনে গান গাইত, নদীর জলে সাঁতার দিত, ময়ূরের সঙ্গে সঙ্গে নাচত।

একদিন হল কী, টুপুর অন্য একটা পাহাড়ি ঝরনার জলে চান করে এসেছে। সেই জলে কী যে বিষ ছিল কে জানে, টুপুরের খুব অসুখ করল। টুপুর মরেই গেল। বেচারি টাপুরের খুব মনখারাপ। টুপুর না থাকলে তার কিছুই ভাল লাগে না। একা-একা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। আর মনের দুঃখু গান গেয়ে গেয়ে গাছপালাদের জানায়। সেই বনের জীবজন্তুরা সবাই টাপুর-টুপুরের বন্ধু, গাছপালারা সবাই টাপুর-টুপুরের সখা-সখী। তাদেরও খুব মনখারাপ হয়েছে। টুপুরের জন্য সারা অরণ্যেই যেন হাওয়া নেই, আলো নেই, খুশি নেই। গাছে ফুল ফুটছে না। শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি বেরোচ্ছে না। বনদেবীর খুব মুশকিল হল। এমন করলে বনরাজ্য চলবে কেমন করে?

বনদেবী টাপুরের কাছে এলেন।

"টাপুর, তোমার মনখারাপ?"

"হ্যাঁ, আমার টুপুরের জন্যে মন কেমন করছে।"

"তুমি যদি আমার কথা শুনে আমি যা বলব তাই করো, তা হলে টুপুরকে ফেরত পেতে পারো। আমি যা বলব তা না করে অন্য কিছু করলে কিন্তু হবে না। ঠিক পারবে তো?"
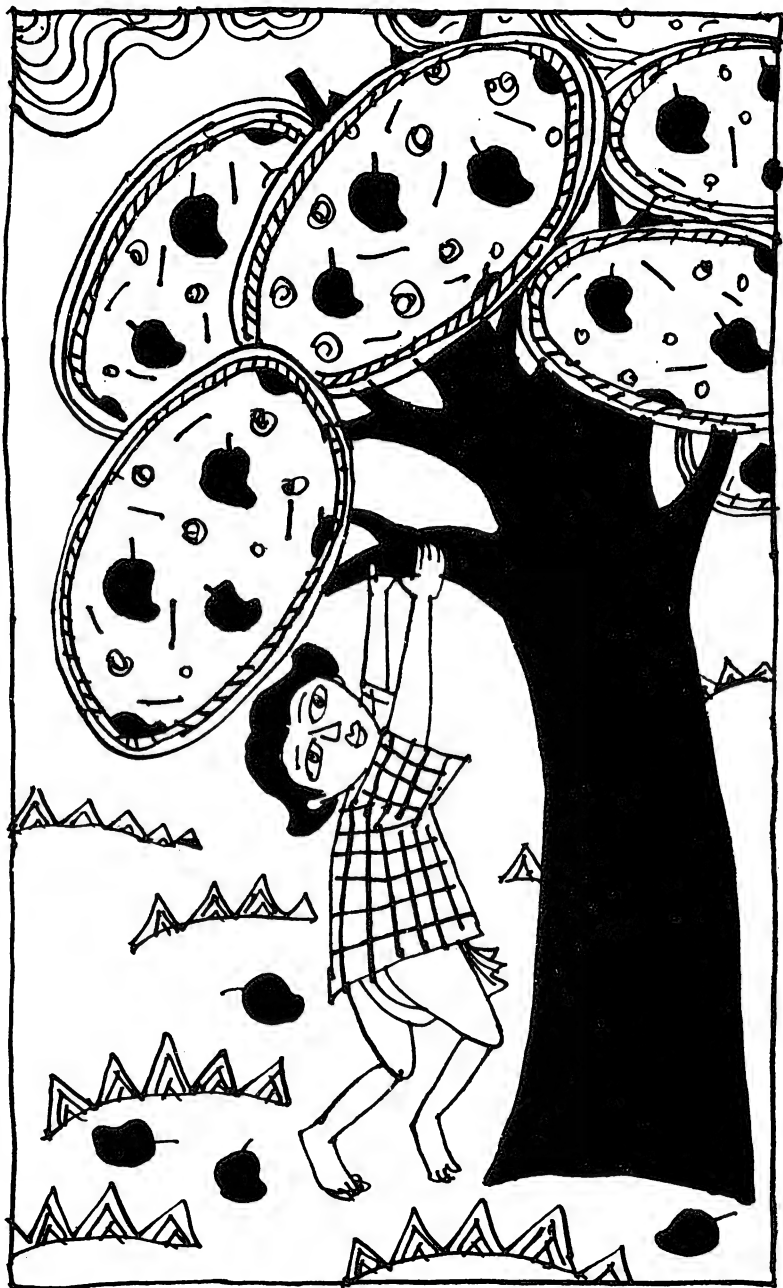
"কেন পারব না? আপনার কথা না শুনে অন্য কাজ করতে যাব? আপনি বনদেবী, আমার টুপুরকে ফিরিয়ে দেবেন, আমি কি আপনার অবাধ্য হতে পারি?"

"তা হলে চলো আমার সঙ্গে।"

টাপুর তো চলল বনদেবীর পিছু পিছু। বনদেবী তখন একটা দীর্ঘ সবুজ আলো হয়ে আগে-আগে যাচ্ছেন, তাঁর দেবীমূর্তি তখন নেই। দেবী বললেন, 'টাপুর, বাছা, আমার কথা ঠিক শুনবে তো? অবাধ্যতা কোরো না কিন্তু!"

"আরে? আচ্ছা মজা তো! কেন শুনব না?"

বনদেবী বন ছাড়িয়ে একটা উপত্যকা দিয়ে চলেছেন। সেই সবুজ আভার পিছু-পিছু টাপুরও হাঁটছে। একটা মাঠের মধ্যে বনদেবী বললেন, "ওঃ, কত ঘোড়া! দ্যাখো, দ্যাখো কেমন বুনো ঘোড়ার দল ছুটে যাচ্ছে!"

"হ্যাঁ, অনেক ঘোড়া বটে!" টাপুর বলল। যদিও টাপুর ঘোড়াটোড়া কিছুই দ্যাখেনি। বনদেবী বললেন, "বাঃ, কী চমৎকার আম ধরেছে এই গাছে! কয়েকটা আম পেড়ে আনো তো টাপুর।" এদিকে না আছে আমগাছ না আম! টাপুর কী করে? সে অন্য একটা গাছে উঠে ডাল নামিয়ে ধরে আম পাড়বার ভান করতেই দ্যাখে তার হাতে পাকা পাকা আম এসে পড়েছে, বনদেবীর ম্যাজিকে। বনদেবীকে আম দিয়ে নিজেও খেতে খেতে চলল টাপুর।

"বাঃ, চমৎকার আম! কী মিষ্টি!" বনদেবী বললেন।

টাপুরও বলে, "খুব মিষ্টি, সত্যি।" কিন্তু আমটা ছিল বেজায় টক!

কিন্তু বনদেবী যা বলবেন, ওকেও তাইই বলতে হবে। অন্য কথা বললে তো চলবে না।

খানিক বাদে আর-একটা বন এসে পড়ল। বনদেবী বললেন, "এই যে আমরা এবার মৃত্যুর শহরে এসে পড়েছি। এখানেই টুপুরকে কোথাও রেখে দিয়েছে যমদূত। এই প্রাসাদটাতে ঢুকে পড়া যাক। ঠিক আমি যেমন করে ঢুকছি, তুমিও তেমনি করে এসো আমার পেছন-পেছন। আমি প্রথমে কড়াটা ধরে দরজা খুলব। পরদাটা তুলে, ঘরে ঢুকব ডান পা তুলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে; মাথা নিচু করে, যাতে ওপরে চৌকাঠে মাথা ঠুকে না যায়।" সবুজ আলোটি এসব কিছুই করল না। কিন্তু টাপুর এমন ভান করল, যেন কড়া ধরে দোর খুলছে, তারপর পরদা তুলে, মাথা হেঁট করে, চৌকাঠ ডিঙিয়ে ডান পা তুলে, সাবধানে ঘরে ঢোকার অভিনয় করল। সামনে ঘরবাড়ি কিছুই নেই। ঘন বন। "ওই যে তোমার বউ বসে আছে। ওর পাশে গিয়ে বোসো।"

টাপুর তাকিয়ে দ্যাখে, সত্যি-সত্যি একটা গাছের তলায় টুপুর বসে আছে।

টাপুর তার পাশে গিয়ে বসল। টুপুর কিন্তু ওকে দেখতেই পেল না। টাপুর ভাল করে দেখল, এটা টুপুর নয়, টুপুরের ছায়া। বনদেবী বললেন, "এবার তোমার বউ রান্না করবে, আমাদের খেতে দেবে।"

টাপুর দেখল পাশে কেউ নেই। টুপুরের ছায়া মিলিয়ে গেছে।

বনদেবী বললেন, "এই যে, টুপুর কী সুন্দর গরম-গরম লুচি, আলুর দম করেছে! ভাল করে খাও।"

টাপুর দেখল সামনে কিছুই নেই। ঘাস, মাটি, নুড়িপাথর। বনদেবী তো আলোর শিখা হয়ে আছেন। কী আর করে? টাপুর লুচি ছিঁড়ে আলুর দম দিয়ে খাওয়ার ভান করতে লাগল। এবার বনদেবী বললেন, "আহ, চমৎকার খেলুম!"

টাপুরও বলল, "আঃ! চমৎকার খাওয়া হল!"

বনদেবী বললেন, "এটা মৃত্যুর শহর, এখানে নিয়মকানুন সব আলাদা টাপুর। যখন এখানে রাত্রি হয়, তোমাদের তখন সকাল। আর মৃত্যুর দেশে যখন সকাল, তখন তোমাদের রাত্রি নামে।"

একটু বাদেই অন্ধকার হয়ে গেল। তখন টাপুর দেখল, সত্যি-সত্যি একটা প্রাসাদে সে বসে আছে। চারদিকে ফিসফাস কথা বলছে কারা যেন। অনেক ছায়ামূর্তি ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। ভয় করছে না একটুও। এদিকে-ওদিকে অনেক প্রদীপ জ্বলছে। একদিকে রান্নাঘরে উনুন জ্বলছে—রান্নাবান্না হচ্ছে। টাপুর দেখল টুপুরের ছায়া আবার তার পাশে এসে বসেছে। টুপুর এখন বেশ হাসিখুশি, দু'জনে অনেক গল্প করল সারারাত। চারদিকে আরও অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারাও মরে-যাওয়া মানুষ। এটা মৃত্যুর শহর, এখানেই তাদের বসবাস। টাপুরই এখানে বাইরের লোক। আস্তে-আস্তে রাত ফুরিয়ে গেল, আকাশ ফরসা হয়ে এল। বনদেবী এসে বললেন, "টাপুর, এবার সবাই চলে যাবে, তোমার বউও। তুমি এখন সারাদিন এখানেই বসে থাকো। কোথাও যেন চলে যেয়ো না। সন্ধেবেলা সবাই আসবে, তখন তোমার বউও আসবে। কোথাও যেয়ো না যেন!"

"না, না, এখানে আর আমি কোথায়ই বা যাব? চুপচাপ বসে থাকব। আপনাকে কথা দিচ্ছি।"

সকাল হতে, টাপুর দ্যাখে সে এক বিশাল তপ্ত মরুভূমিতে পড়ে আছে। সূর্য মাথার ওপর জ্বলছে। পায়ের নীচে গরম বালি। ছায়া নেই কোনওদিকে। একফোঁটা জল নেই, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। মাথায় রোদের তাত, পায়ে বালির তাত, টাপুরের অবস্থা কাহিল। তবু টাপুর নড়ল না। টুপুরকে ফিরে পাওয়ার আশায় টাপুর সব সহ্য করে সেই মরুভূমিতে বসে রইল। জলের খোঁজে, কি ছায়ার

খোঁজে কোথাও গেল না। সন্ধেবেলা আবার সেই ছায়াপ্রাসাদ ভেসে উঠল, ভাল ভাল খাবারদাবার, শরবৎ নিয়ে টুপুর এল, আনন্দে আহ্লাদে রাত্রি কেটে গেল।

এমনি করে পুরো এক মাস কাটল, অমাবস্যা-পূর্ণিমা পার হল। বনদেবী বললেন, "টাপুর তোমার ওপর আমি খুশি হয়েছি, কাল সকালে টুপুরকে নিয়ে বনে ফিরে যেয়ো। পাঁচটা পাহাড়, পঞ্চপর্বত পেরিয়ে, তবে তোমার বন। যতক্ষণ না পাঁচ নম্বর পাহাড়টা পার হয়ে যাচ্ছ, টুপুরকে যেন ছুঁতে যেয়ো না। পাঁচ দিন, পাঁচ রাত পরে, তুমি তোমার বউয়ের হাত ধরতে পারো। তার আগে নয়। এইটে মনে রেখো।"

বনদেবীকে প্রণাম করে টাপুর রওনা হল। আবছা ছায়া-ছায়া টুপুরও চলল তার সঙ্গে-সঙ্গে। প্রথম পাহাড় সবুজ রঙের। সবুজ পাহাড় ডিঙোনোর পরে টুপুরের ছায়াটি যেন একটু ঘন হয়েছে মনে হল। দ্বিতীয় পাহাড় নীল রঙের। নীল পাহাড় ডিঙোনোর পরে আর-একটু ঘন। প্রত্যেকটা পাহাড় পেরনোর পর টুপুরের গায়ে যেন একটু করে গত্তি লাগছে, আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, অশরীরী থেকে শরীরী হয়ে আসছে ক্রমশ। তৃতীয় পাহাড়টি গোলাপি রঙের। চতুর্থটি হলুদ। হলুদ পাহাড় পেরিয়ে এসে টুপুর যেন ঝলমল করছে। গোলাপি পাহাড়ের গোলাপফুল রং তার গালে, ঠোঁটে, হলুদ পাহাড়ের সোনা তার হাসিতে, সবুজ পাহাড়ের শ্যামলছায়া তার সারা গায়ে—আর নীল পাহাড়ের ঘন নীলচে-কালো রং তার চোখের মণিতে। এবার আসছে পঞ্চম পাহাড়। এটার নাম ধুম্রপাহাড়, ধোঁয়া রং, কুয়াশাঘেরা পাহাড়। টাপুর লাফাতে-লাফাতে এগোচ্ছে, টুপুরও লাফাতে-লাফাতে যাচ্ছে। হঠাৎ টুপুরের পায়ে হোঁচট লাগল, আর বনদেবীর উপদেশ ভুলে গিয়ে টাপুর তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গেই টুপুর আবার ছায়া হয়ে, ধোঁয়া হয়ে ধুম্রপাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেল, আর-একটা হরেক রঙের নাম-না-জানা পাখি করুণ কান্নার সুরে ডাকতে-ডাকতে উড়ে চলে গেল টাপুরের সামনে দিয়ে। টাপুর কেঁদে উঠল, "এটা খুব অন্যায়! এটা কিন্তু ঠিক হল না!" কিন্তু সে কান্না কে শুনছে?

হঠাৎ একটা ইঁদুরনি বেরিয়ে এল ধুম্রপাহাড়ের গর্ত থেকে। সে বলল, "টাপুর, এটাই পৃথিবীর নিয়ম। তুমি কেঁদো না। দ্যাখো না, ঘাসেরা শুকিয়ে যায়, আবার গজায়। ফুলেরা ঝরে যায়, আবার ফোটে। শুকনো পাতার জায়গায় কচিপাতা জন্মায়, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, মানুষ-টানুষ সবার বেলাতেই এই নিয়ম। এই যে সেদিন আমার পাঁচটা কচি ছানাকে উদ্‌বেড়ালে খেয়ে ফেলল, ওদের কি আমি ফিরে পাব? উদ্‌বেড়ালের ওপরেই বা রাগ করে কী হবে? সে তো তার খাবারই

খেয়েছে! টাপুর, তুমি কেঁদো না। তুমি বরং টুপুরের খুব সুন্দর একটা ছবি আঁকো। যেটা দেখলে তোমার মনে আনন্দ হবে।''

ইঁদুরনির কথায় টাপুরের মন শান্ত হল। সে নিজের বনে ফিরে গিয়ে, একটু একটু করে পাঁচ পাহাড়ের রং মিশিয়ে অনেক দিন ধরে অতি অপরূপ একটা ছবি আঁকল টুপুরের, সেই ছবিতে টুপুর হাসছে। টাপুর বলল, 'টুপুর, আহা—তুমি যদি এখন আমার সঙ্গে নদীর কূলে এসে বসতে; এত সুন্দর সূর্যাস্তটা দেখতে একা একা কি ভাল লাগে?''

তক্ষুনি আকাশ দিয়ে তথাস্তুমুনি যাচ্ছিলেন, 'তথাস্তু' 'তথাস্তু' বলতে বলতে। যেই টাপুর কথাটি বলেছে, অমনই তিনিও 'তথাস্তু' বলে ফেলেছেন। আর তখনই ছবির টুপুর জ্যান্ত হয়ে এসে টাপুরের হাতটি ধরেছে! যেই না ধরা, অমনই কে যেন হাততালি দিয়ে, ''বাঃ! বাঃ! এই তো কী সুন্দর,'' বলে উঠল। টাপুর-টুপুর দ্যাখে গাছের গোড়ায় এক গর্ত থেকে উঁকি মারছে এক মোটাসোটা ইঁদুরনি। ইঁদুরনি একগাল হেসে বলল, 'টাপুর, আমার আবার ছ'টা ছানা হয়েছে!'' ছোট্ট-ছোট্ট গোলাপি ছানাগুলোও তার পেছনে।

টাপুর-টুপুর বলে উঠল, ''আমরা ওদের খুব করে পাহারা দেব, উদ্‌বেড়াল আর ধরতেই পারবে না।''

বনদেবী এদের কথাবার্তা শুনে হাসলেন।

প্রকাশকাল : ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

আলো আর আঁধার

এক বুড়ো কাঠুরিয়ার দুটি নাতনী ছিল। তাদের মুখগুলো যেমন সুন্দর, তাদের মনগুলোও তেমনি সুন্দর। একটি চঞ্চল, একটি শান্ত। চঞ্চলটির নাম দিবা, আর শান্তটির নাম রাতি। কাঠুরিয়া বুড়ো হয়েছে, আর কাঠ কাটতে পারে না তেমন, কষ্ট হয়। দিবা-রাতি যায় বনে কাঠ কুড়োতে। খুব পরিশ্রমী মেয়ে তারা। কাঠ কুড়িয়ে, বাণ্ডিল বেঁধে, মাথায় করে হাটে নিয়ে যায়। সেই কাঠ বিক্রি করে চাল-ডাল-কাপড়-গামছা, সব কিছু কিনে আনে।

একদিন তাদের হাট থেকে ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল। ভীষণ ক্লান্ত দুই বোন বনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। সেটা পূর্ণিমা রাত্রি, তাই ভয় করল না। একটু পরেই বন আলোয় আলো হয়ে যাবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুই বোনই স্বপ্ন দেখল আকাশ থেকে একটা তারা নেমে এসেছে তাদের পাশে, আর সেই তারা থেকে রাজপুত্তুরের মতো সুন্দর এক নক্ষত্রপুত্র বেরিয়ে এসে তাদের ডাকাডাকি করছে—"ওঠো ওঠো!" দুই বোন একই সঙ্গে জেগে উঠল। দেখল, তাই তো? সত্যি সত্যি পরম রূপবান একটি ছেলে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ডাকছে। ছেলেটি বলল, "এখানে কেন, তোমরা ঘরের ভেতরে ঘুমোবে চল।" বলে সেই তারার ওপরে বসিয়ে দুই বোনকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে চলল।

তারাটা যেন একটা ছ'কোণ বারান্দা। দিবা-রাতি তাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে নিচে অরণ্য প্রান্তর নদী পাহাড় সব চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। ছেলেটি ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বলল, সে চাঁদের বুড়ির ছোট ছেলে। চাঁদের বুড়ির বড় ছেলে গেছে ম্যাজিক আগুন নিয়ে আসতে। সেখানে যাওয়া খুব
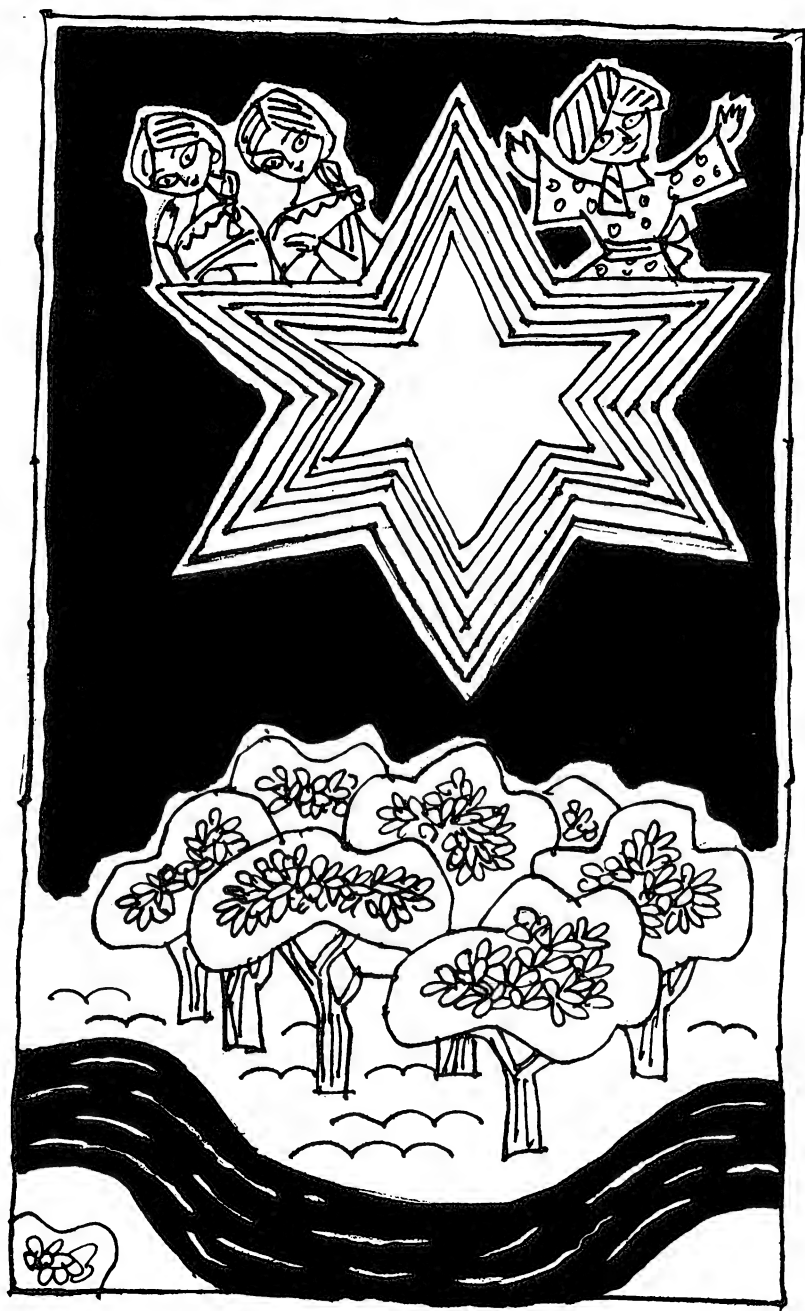
শক্ত। কিন্তু চাঁদের বুড়ির বড় ছেলে সব শক্ত শক্ত কাজ করে ফেলতে ওস্তাদ।

আকাশে পৌঁছে ওরা দ্যাখে চাঁদের বুড়ি বসে চরকা কাটছেন। মেয়েদের দেখে বললেন, "আহা বাছারা, খালি পেটে ঘুমিয়ে পড়েছে! ওদের কত খিদে পেয়েছে!" বলে ছোট্ট একটা বাটিতে করে দশটা চালে ভাত বসিয়ে দিলেন। সেই দেখে দিবা বললে, "ওমা! ওতে করে কারই বা পেট ভরবে?" রাতি বললে, "চুপ চুপ এ কি আমাদের দেশ? এ চাঁদের দেশ। এখানে কী না হয়!"

সত্যি সত্যি সেই দশটা চালে এত ভাত হল যে ঘি দিয়ে মেখে খেয়ে দুই বোনে ফুরোতে পারল না। চাঁদের বুড়ি মিষ্টি হেসে বললেন, "কী গো? পেট ভরেছে তো? এই বাটিটা আর এই দশটা চাল তোমরা নিয়ে যাও। তোমাদের কোনদিন পেটে খিদে নিয়ে শুতে যেতে হবে না।"

তারপরে দিবা আর রাতিকে তিনি চমৎকার মেঘের বিছানা পেতে শুতে দিলেন, আর চরকার গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

তখনো পুরোপুরি সকাল হয়নি, আকাশের আঁধার একটু হালকা হয়েছে কেবল, আবার তাদের ডেকে তুলে দিলেন চাঁদের বুড়ি। চরকা থেকে একটা সুতো নিয়ে বললেন, "এই সুতোটা শক্ত করে ধরে থাকো দুজনে, আমি তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।"

দিবা আবার বলে ফেললে, "ওমা! সুতো তো ছিঁড়ে যাবে! আমাদের দুজনের ভার সইবে কেমন করে? যা সরু সুতো!" কিন্তু রাতি মনে করিয়ে দিলে, "দেখলি না, দশটা চালে কত ভাত হয় এখানে? এই সুতো হয়তো নাইলনের দড়ির মতন শক্ত!"

তারপর সেই সুতো বেয়ে দুজনে তো নিচে নেমে এল। এসে দেখে, বাঃ! একেবারে নিজেদের কুটিরের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। বুড়ো কাঠুরিয়ার এদিকে ভীষণ ভাবনা হয়েছে, সে বাইরে এসে বসে আছে, নাতনীরা কখন ফিরবে। এখন দুদিক থেকে দুজনে জড়িয়ে ধরে তাকে বললে, "দ্যাখো দাদু, আমরা কী এনেছি!"

চাঁদের বুড়ির কল্যাণে তাদের আর কোনদিন ভাতের অভাব হয় না। কিন্তু তেল-সাবান তো চাই? কাপড়-গামছা তো চাই? বোনেরা তাই কাঠ কুড়োতে যায়। কাঠ কুড়িয়ে বাণ্ডিল বেঁধে হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে যখন যা দরকার কিনে আনে। আরেকদিন অমনি বাজার করে ফিরতে তাদের ভয়ানক দেরি হয়ে গেল। সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত—তারার আলোয় পথ চলছে, কিন্তু বনের ভেতরে তাতে পথ দেখা যায় না। বড় বড় গাছের ছায়া, বড্ড অন্ধকার। কী

করে? দুই বোন আবার গুটিশুটি বনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুজনে স্বপ্ন দেখছে একজন কালোকালো ষণ্ডাগুণ্ডা মতন লোক এসে তাদের ডাকছে—"ওঠো, ওঠো!" ভয়ের চোটে তো ঘুম ভেঙে দুই বোন লাফিয়ে উঠেছে। দ্যাখে সত্যি সত্যি একজন কালোকালো ষণ্ডাগুণ্ডা মতন লোক! সে বলল, "আহা, তোমরা এইখানে ঘুমুচ্ছো কেন, এখানে কত বিপদ-আপদ, চলো ঘরের মধ্যে ঘুমোবে চল।"

বলতে না বলতেই সেখানে ঝুপ করে গাছ থেকে পড়ল এক বিষাক্ত সাপ। দিবা-রাতি কিছু ভাববার আগেই লোকটা সাপের গায়ে আলতো একটা টোকা মারল। আর সাপ তক্ষুনি পুড়ে ছাই। অবাক কাণ্ড! দেখে বোনেদের গায়ে কাঁটা দিল।

লোকটি ওদের অভয় দিয়ে বলল, "অবাক হবার কিছু নেই। আমার কাছে ম্যাজিক আগুন আছে কিনা? তাই আমার এত শক্তি।"

দিবা-রাতি কোরাসে বলে উঠেছে, "আপনি বুঝি চাঁদের বুড়ির বড় ছেলেটি?"

এবার সেই লোকের অবাক হবার পালা। "তোমরা কী করে আমাকে চিনলে?"

"আপনার ছোটভাই বলেছিল কিনা, আপনি ম্যাজিক আগুন আনতে গেছেন।"

"তোমরা তাহলে আমার ছোটভাইকেও চেনো?"

"চিনিই তো। আপনিও কি আমাদের তারায় চড়িয়ে আপনাদের বাড়িতে নিয়ে যাবেন?"

হো হো করে হেসে উঠে লোকটা বলল, "তারা-টারা নয়, আমি এসেছি অন্ধকারের পিঠে চড়ে।"

অন্ধকার ঠিক একটা তেজী কালো পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতন—তার পিঠে দুই বোনকে বসিয়ে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেল সে। গিয়ে পৌঁছুলো অন্য একটা বাড়িতে। চাঁদের উলটো পিঠে। পৃথিবীতে যখন অমাবস্যার অন্ধকার হয়, তখন আসলে চাঁদের বুড়ি যান তার বড় ছেলের বাড়িতে চরকা কাটতে।

আঁধার বলল, "মাগো, দ্যাখো কাদের নিয়ে এসেছি। এদের বিছানা পেতে দাও।"

চাঁদের বুড়ি দিবা-রাতিকে দেখে খুব খুশি। কিছু দিন আগে ছোটছেলে আলো গিয়েও তো এই মেয়ে দুটিকেই নিয়ে এসেছিল।

চাঁদের বুড়ি বললেন, "এসো মা, বোসো মা, তোমাদের জন্যে ভাত চড়াই মা।"

কিন্তু মেয়েরা আজ বললে, "আমরা খাব না, আমাদের বনের ফল খেয়েই খিদে মিটে গেছে, আমাদের বড্ড ঘুম পেয়েছে।"

তখন চাঁদের বুড়ি একটা সুন্দর কাঠের সিঁদুরকৌটো নিয়ে এসে, মেয়েদের হাতে দিয়ে বললেন, "তোমরা এর মধ্যে ঘুমোও।"

অবাক হয়ে দুই বোন বলে উঠল, "ও মা এর ভেতরে ঢুকবো কেমন করে আমরা?"

চাঁদের বুড়ি ফিক করে ফোকলা গালে হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট্ট কৌটো একটা মস্ত ঘর হয়ে গেল, তাতে নরম, সুগন্ধী, ফর্সা ধবধবে বিছানা পাতা। দিবা-রাতির ক্লান্ত শরীর। তারা শুলো, আর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে উঠে দ্যাখে কখন যেন ঘুমের মধ্যেই কোন ম্যাজিকে ফিরে এসেছে ওদের নিজেদের কুটিরে। কিন্তু কুটির আর সেই ভাঙা কুটিরটি নেই। নতুন খড়, নতুন মাটি, পাকা মেঝে, কী চমৎকার একটা কুটির, তাতে তক্তপোশে নতুন বিছানা পাতা, সেই বিছানায় দাদুর পাশে তারা ঘুমিয়ে আছে। কেমন করে এমনটি হল?

তাই তো? তাই তো?

কিছু বোঝবার আগেই কুটিরের দরজায় এসে দাঁড়াল দুটি ছেলে। একজনের রং পূর্ণিমার আলোর মতন, আর একজনের রং ঠিক অমাবস্যার অন্ধকারের মতন। কিন্তু দুজনেই ভারি সুন্দর। আর তাদের মুখের হাসিদুটো খুব মিষ্টি, খুব চেনা চেনা।

কাঠুরিয়াদাদু বললেন, "এসো বাছারা, বোসো বাছারা, একটু জল খাও, একটু বাতাসা খাও। তারপরে বলো দেখিনি তোমরা কে? কোত্থেকে এসেছো?"

দিবা জল আনল, রাতি বাতাসা আনল। জলবাতাসা খেয়ে, একটু জিরিয়ে নিয়ে তারা বললে, "দাদু, আমরা চাঁদের বুড়ির দুটি ছেলে, আলো আর আঁধার। আমাদের আপনি চেনেন। আপনার দুটি ভালোমানুষ নাতনীকে আমরা বিয়ে করতে চাইছি। আপনি কি অনুমতি দেবেন?"

কাঠুরিয়া বললে, "দাঁড়াও বাছারা, তাদের আগে মতামতটা জেনে নিই, তবে তো অনুমতি?"

নাতনীদের মুখ আহ্লাদে ঝলমল করছে দেখে কাঠুরিয়া হেসে বললে, "নাঃ, আর জিজ্ঞেস করতে হবে না, মতটা জানতেই পেরে গেছি!"

হৈ হৈ করে দু'বোনের বিয়ে হয়ে গেল। তারার দল বরযাত্রী এসেছিল। কাঠুরিয়া

তো খুব খুশি। সে এখন আকাশে গিয়ে চাঁদের বুড়ির সঙ্গে আড্ডা মারে আর তারাদের সঙ্গে লুডো খেলে। আর তার দুই নাতনী দিবা আর রাতি মনের সুখে আলো আর আঁধারের সঙ্গে ঘরকন্না করে। আর চাঁদের বুড়ি? চরকা কাটেন, আর গান করেন। গান করেন, আর চরকা কাটেন।

প্রকাশকাল : ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

হাবু গাবু সাবু

পাঁচমিশেলী নামে একটা গ্রাম ছিল। সেই গাঁয়ে তিন বন্ধু থাকত। তিনজনেই গরিব মানুষ। কেন না তিনজনেই একটু বোকাসোকা। লেখাপড়াও শেখেনি। কোনও কাজকম্মোও শেখেনি। আজ এর বাড়ি খায়, কাল ওর বাড়ি খায়। গাঁয়ের লোকেরা ভালো, তাই ওদের অসুবিধে হয় না। একদিন মোড়লমশাই ওদের বললেন, "ওরে হাবু গাবু সাবু, তোদের জন্য আমার বড় ভাবনা! আমি তো বুড়ো হয়েছি, কেউ নতুন মোড়ল আসবে, গাঁয়ের নিয়মকানুন হয়তো পালটে দেবে। তোদের যদি খেতে পরতে না দেয়? তার চেয়ে এক কাজ কর বাবা, তোরা রাজার কাছে যা, রাজামশাই খুব ভালো লোক, তোদের একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। গিয়ে একটু ভালো করে কথাবার্তা বলিস, তাহলেই হবে।"

ব্যস, ওমনি তিন বন্ধুর মহা আনন্দ। চলল তারা রাজপুরীর দিকে। পথে বন-পাহাড়-নদী-নালা-ক্ষেত-খামার কত কী পড়ছে। ওরা হাঁটছে তো হাঁটছেই। হঠাৎ ওদের মনে পড়ল মোড়লমশাই বলেছেন, গিয়ে একটু ভালো করে কথা বলতে হবে। ভালো করে কথা বলাটা কী ব্যাপার সেটা তো জেনে আসা হয়নি। কী ভালো কথা বলা যায়? কী ভালো কথা বলা যায়? বন্ধুদের মহা ভাবনা হল।

যেতে যেতে পথে একটা ইঁদুরের গর্ত। গর্ত থেকে মাটি তুলছে এক গাব্দা-গোব্দা মেঠো ইঁদুর। দেখেই এক বন্ধু, তার নাম হাবু, বলে উঠল, 'ওরে, আমি একটা ভালো কথা পেয়েছি। আমি জানি কী বলব। আমি বলব—

'ওই দ্যাখ দ্যাখ তুলছে মাটি
টাকুর টুকুর টুক!'

"কী? ভালো কথা না?"

শুনে খুশি হয়ে গাবু সাবু বলল, "খুব ভালো!"

হাঁটতে হাঁটতে একটা পুকুরপাড় এল। সেখানে মস্ত এক কোলা ব্যাঙ থপাস করে লাফ দিল। অমনি গাবু বলে উঠল, "পেয়েছি, পেয়েছি, আমিও একটা ভালো কথা পেয়েছি, আমি বলব—

'ওই দ্যাখ দ্যাখ, পড়ল বসে
থাপুস থুপুস থুপ!'

"কী? ভালো কথা না?"

হাবু সাবু মহা আহ্লাদে বলল, "খুব ভালো।"

যেতে যেতে যেতে ওরা দেখে একটা জলার মধ্যে জল-কাদার ভেতরে ঠাণ্ডায় মা শুয়োরটি শুয়ে খুব্‌সে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর বাচ্চাগুলো আহ্লাদে খুর খুর করে মায়ের কাছে খাচ্ছে। সাবু দেখে বলে—

'জল ছপ্ ছপ্ জল ছপ্ ছপ্
তোমার মনে কী
খুর খুরিয়ে কোন্ দিকে যাও
জানতে পেরেছি!'

"আমার কথাটাও ভালো হয়নি?"

শুনে তো হাবু-গাবু আনন্দে সারা! তারা বলে, "খুব ভালো কথা। এটাই সবচেয়ে ভালো কথা হয়েছে।" তারপর পাছে আবার ভুলে যায়, তাই শহরে ঢুকেই একটা চায়ের দোকানের ছোকরাকে ধরে একটা লম্বা কাগজে তাদের ভালো ভালো কথাগুলো সব লিখিয়ে নিল। নিজেরা তো লেখাপড়া শেখেনি। বুদ্ধিসুদ্ধিও গজায়নি। তিন বন্ধু মনের আনন্দে তিনটে ভালো কথা একখানা কাগজে লিখে নিয়ে রাজার কাছে হাজির। রাজসভায় ঢুকে একগাল হেসে, "পেন্নাম হই রাজামশাই।" বলে তারা সগর্বে ওই কাগজটি রাজার হাতে দিল।

রাজার কাছে সকলেই আবেদন নিবেদন পেশ করে। লম্বা লম্বা কাগজে লিখে কত কী চায়। রাজা আবেদন ভেবে কাগজটা নিলেন। তারপর পড়তে গিয়ে তো চক্ষু ছানাবড়া! চশমাটা পরে নিলেন। তবুও মাথামুণ্ডু কিছুই তার মগজে ঢুকল না। কাগজে লেখা আছে :

'রাজামশাইকে প্রণামপূর্বক নিবেদন—

'ওই দ্যাখ দ্যাখ তুলছে মাটি
টাকুর টুকুর টুক!

ওই দ্যাখ দ্যাখ, পড়ল বসে
থাপুস থুপুস থুপ!
জল ছপ্ ছপ্ জল ছপ্ ছপ্
তোমার মনে কী
খুর খুরিয়ে কোন্ দিকে যাও
জানতে পেরেছি!

ইতি হাবু-গাবু-সাবু
পাঁচমিশেলী গ্রাম।'

ব্যস আর কিছুই তাতে লেখা নেই। রাজার তো পড়তে পড়তে দুটি ভুরু কুঁচকে গেল, নিচের ঠোঁটটা উল্টে গেল, চোখের মণি ট্যারা হয়ে গেল। সেই না দেখে হাবু গাবু সাবু তিন বন্ধু ভয়ের চোটে দে ছুট, দে ছুট। এক্কেবারে রাজপুরী থেকে দশ মাইল দূরে বনের মধ্যে। '...ওরে বাবা, রাজামশাই রেগে গেছেন! এবারে বলবেন, তোমরা কী লিখেছ এটা, শিগগির পড়ে দাও! আমরা তো পড়তে জানি না। কী জানি সেই ছেলেটা কী না কী লিখে দিয়েছে! ভালো কথার বদলে যদি মন্দ কথা লিখে থাকে? ওরে বাবারে!' ভিতু ছেলে তিনটের রাজামশাইয়ের কাছে কিছু চাওয়া আর হল না। তারা বনের মধ্যেই লুকিয়ে বসে রইল।

* * * *

রাজামশাই এদিকে ট্যারাচোখে, ভুরু কুঁচকে, ঠোঁট উলটে, চশমা পরে কাগজ হাতে স্ট্যাচু! কাগজের গুপ্তমন্ত্র তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে।

এদিকে হয়েছে কি, রাজামশাইয়ের মন্ত্রীটির একটি দুষ্টু ছেলে আছে। সে রাজার নাপিতকে বলেছে, কালকে সকালে দাড়ি কামানোর সময়ে রাজার গলায় ক্ষুর চালিয়ে দিতে। তাহলেই রাজার মৃত্যু হবে। আর সে জবরদস্তি সিংহাসনটি কেড়ে নেবে। রাজার তো ছেলে নেই! তিন মেয়ে। কোতোয়ালেরও একটা দুষ্টু ছেলে আছে। সে ঠিক করেছে রাজবাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সেদিন রাত্তিরবেলায় রাজার ঘরে সিঁদ কেটে ঢুকে সিন্দুক থেকে মুকুটটা চুরি করবে। আর রাজদণ্ডটা। পরদিন ভোরবেলায় মাথায় ওই মুকুটটা পরে রাজদণ্ড হাতে সিংহাসনে বসে কোতোয়ালের ছেলে রাজা হয়ে যাবে। কে তাকে আটকাবে?

এদিকে সেই রাত্রে রাজামশাইয়ের তো প্রাণে সুখ নেই, মনে শান্তি নেই, চোখে ঘুম নেই। তিনি রাজপালঙ্কে বসে বসে সেই কাগজখানার মর্ম উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। তিন'শ তেত্রিশবার পড়েও মাথায় কিছুই ঢোকেনি। তিনি ভাবছেন মন্ত্রীকে ডেকে পাঠাবেন কি না!

ওদিকে সিঁদকাটি নিয়ে কোটালপুত্তুর আর দারোয়ান তো টুক টুক করে মাটি খুঁড়ে রাজার ঘরের দেওয়াল ফুটো করছে। ফুটো করতে করতে ঠিক যখন রাজার ঘরে ঢুকে পড়বে, তারা গর্ত থেকেই শুনতে পেল রাজা গম্ভীর গলায় বলছেন—

'ওই দ্যাখ দ্যাখ তুলছে মাটি
টুকুর টুকুর টুক!'

শুনেই তো তারা দু'জনে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়েছে ভয়ের চোটে। যেই না বসে পড়া, ওমনি শুনতে পেল রাজা বলছেন—

'ওই দ্যাখ দ্যাখ, পড়ল বসে
থাপুস থুপুস থুপ!'

সেই শুনে চোরেরা তো ভয়ে একেবারে কেঁচো। কোনওমতে বেড়িয়ে এসে কেঁদে পড়েছে রাজার পায়ে। রাজা সব কিছু জানতে পেরে গেছেন, সব দেখে ফেলেছেন—আর ওদের রক্ষে নেই। এখন প্রাণ ভিক্ষে চাওয়া ছাড়া পথ নেই! এই তারা মনে করেছে। রাজা তো সব ব্যাপারটাই বুঝেছেন, কিন্তু ওদের কিছু জানালেন না। আসলে রাজা শুনতেও পাননি, দেখতেও পাননি। রাজা বললেন, 'হুম্‌ম্, খুবই খারাপ কাজ করেছ। ঠিক আছে, প্রাণ ভিক্ষে দিলুম—কিন্তু তোমাদের শাস্তি, সাতসমুদ্দুর পারে দ্বীপান্তর। প্রহরী, এদের নিয়ে গিয়ে কারাগারে পুরে দাও।'

রাজার মনে খটকা! তাহলে মন্ত্রটা কি—

পরদিন সকালে তো রাজার নাপিত এসেছে দাড়ি কামাতে। রাজ-পরামানিক বলে কথা! তার চালচলনই আলাদা। সে রূপোর বাটিতে গোলাপজল নিয়ে ক্ষুর শান দিচ্ছে। রাজার গায়ে সিল্কের গামছা জড়িয়ে দিয়েছে এপ্রনের মতন। শান পাথরে শব্দ হচ্ছে শাঁই শাঁই। হঠাৎ তার মনে হল, রাজা বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন, আর চোখের কোণ দিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। সে কান পেতে শুনতে পেল

রাজামশাই বলছেন—

'জল ছপ্ ছপ্ জল ছপ্ ছপ্
তোমার মনে কী
খুর খুরিয়ে কোন্ দিকে যাও
জানতে পেরেছি!'

আর যাবে কোথায়? নাপিতভায়া তক্ষুনি ক্ষুরটুর-সুদ্ধুই রাজার পায়ে পড়ে মাপ চাইল। পাপীর মন তো? 'খুরখুরিয়ে'র বদলে সে শুনেছে 'ক্ষুর ক্ষুরিয়ে' মানে, 'ক্ষুরে শান দিয়ে' বলছেন নিশ্চয়ই। এই ভেবে নাপিত ভয়ে কাঠ-পাথর হয়ে গেছে। তখন সে রাজার কাছে কেঁদে কেঁদে স-ব কথা প্রকাশ করে ফেললে। মন্ত্রীপুত্তুরের কুবুদ্ধিতেই সে আজ ক্ষুরে শান দিচ্ছিল। রাজামশাই বুঝলেন গোলমালটা কোথায়—তিনি বললেন, "বেশ তোমাকে আধখানা মাপ করে দিলুম। তোমার প্রাণ নেব না, তুমি সাতসমুদ্দুর পারের দ্বীপান্তরে চলে যাবে। আর তোমার সঙ্গে বন্ধু মন্ত্রীপুত্তুরকেও পাঠাচ্ছি, দাঁড়াও! এ রাজ্যে তোমাদের ঠাঁই নেই। বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বড় পাপ হয় না।"

* * * *

রাজামশাই সভায় গিয়ে মন্ত্রীকে ডাকলেন, কোতোয়ালকে ডাকলেন। মন্ত্রীপুত্রকে ধরে আনলেন পাইক পেয়াদা পাঠিয়ে। মন্ত্রী আর কোতোয়াল তো একই সঙ্গে লজ্জায় অধোবদন আর রাগে রক্তচক্ষু। ছেলেদের ওপর যেমন রাগ তাদের কুকর্মের জন্যে তেমনি লজ্জা। ওদিকে দারোয়ান আর নাপিত তারা দু'জনেও প্রচণ্ড বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এক্কেবারে নিদারুণ! রাজা তাদের সবাইকে জন্মের শোধ সুদূর দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে জনমানব নেই, জীবজন্তু নেই, গাছপালাও নেই। শুধু ধুলোবালি আর তাতে লাল পিঁপড়ের বাসা।

তারপর মন্ত্রীকে আর কোতোয়ালকে বললেন, "এইবার আমি এই গুপ্তমন্ত্রের মানে বুঝতে পেরেছি। তোমরা দু'জনে যাও পাঁচমিশেলী গ্রামে, গিয়ে হাবু-গাবু-সাবুকে ধরে আন। তারাই আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে। সেই ছেলেগুলিকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই। এতই নির্লোভ যে ওরা কিছুই না চেয়ে, কিছুই না নিয়ে চলে গেছে। উপহার দিয়ে গেছে আমাকে আমার জীবন, আর রাজ্যকে তার

রাজা। একদিকে কোটালপুত্তুর, মন্ত্রীপুত্তুর, নাপিত আর দারেয়ানের কুকীর্তি, অন্যদিকে দ্যাখো, হাবু-গাবু-সাবুর সুকীর্তি। জগতে ঠিক ভালো-মন্দের সমান সমান ব্যালান্স হয়ে যায়। তোমাদের ছেলেরা লোভী আর অসৎ হয়েছে বটে, সময়ের দোষে। এখন কে জানে, আমার যদি রাজপুত্তুর থাকত এমনি দিনকালে সে কেমনটি হত! আমার আছে তিনটি তুলনাহীন রাজকন্যে। তিনজনেরই গুণের সীমা নেই। তারা কোনও মন্দ কাজ করতে পারেই না! এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে হাবু-গাবু-সাবুকে ডেকে আন। আমার তিনমেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। এমন সৎপাত্র আর জুটবে না।

* * * *

এদিকে হাবু-গাবু-সাবু তো ঘোর বনে পালিয়ে গিয়ে একেবারে হারিয়েই গেছে! বনের মধ্যে ঘুরতে, ঘুরতে, ঘুরতে, ঘুরতে, আর বেরুনোর পথই খুঁজে পায় না বেচারীরা। হঠাৎ কেমন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটা কান্না শুনে ওরা চেয়ে দেখে কি, একটা ডোরাকাটা কেঁদো বাঘ। একটা গর্তে পড়ে গেছে, কিছুতেই বেরুতে পারছে না। ওদের দেখে কাঁদো কাঁদো গলায় বাঘ বললে, "আমাকে প্লীজ, বের করে দাও, তোমরা যা চাইবে তাই দেব।"

সেই শুনে হাবু-গাবু-সাবু ব্যস্ত হয়ে বললে, "দাঁড়াও ভাই, আগে আমরা দড়ি খুঁজি।"

বাঘ বললে, "দড়ি কোথায় পাবে? এ তো এক জঙ্গল, এখানে বরং বটের ঝুড়ি পাবে।"

হাবু-গাবু-সাবু তখন বটের ঝুড়ি কেটে এনে গর্তে নামিয়ে দিল। বাঘ বেশ শক্ত করে ঝুড়িটা ধরে রইল। আর তিন বন্ধু তাকে হেঁইও হেঁইও করে টেনে তুলল। উপরে উঠে নিচু হয়ে তাদের নমস্কার করে বাঘ বললে, "থ্যাংক ইউ— তোমরা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, তোমাদের কিছু উপকার আমার করা উচিত। আমি তো বুঝতেই পারছি তোমাদের ঘটে মোটে বুদ্ধি নেই। থাকলে তোমরা আমাকে টেনে তুলতে না। আমি যদি তোমাদের এবার খেয়ে ফেলি?"

শুনেই তো 'ওরে বাবারে,' বলে কাঁপতে কাঁপতে হাবু-গাবু-সাবু প্রাণ ভয়ে এতোল বেতোল ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু বাঘেরা ছোটে তো আরও জোরে, এক বিরাট লম্ফ দিয়ে বাঘ তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। পড়েই দু'হাত ছড়িয়ে বলল, "মা ভৈঃ! ভয় পেওনা ভাই, আমি তোমাদের খাব না।

বিশ্বাসঘাতকতা বনের প্রাণীরা করে না, ও তোমাদের মানুষদের কাজ। চল আমি বরং তোমাদের একটা ঝর্ণাতলায় নিয়ে যাই, সেখানে চান করলেই তোমাদের বন্ধ বুদ্ধি খুলে যাবে।"

হাবু-গাবু-সাবু খুব খুশি হয়ে নাচতে নাচতে বাঘের সঙ্গে চলল আরও গভীর আরও গহন বনে। অনেক জলা-জঙ্গল, অনেক নদী-পাহাড় পেরিয়ে একটা গুহায় অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকল বাঘ। বাঘের পিছু পিছু হেঁট হয়ে হামা দিয়ে চলল তারাও তিনজনে। চলছে তো চলছেই। খানিকক্ষণ পরে শুনতে পেল যেন পিয়ানোর মতন, যেন জলতরঙ্গের মতন, মিষ্টি মধুর বাজনার শব্দ করে নুড়ির ওপরে ঝর্ণার জল ঝরছে। যদিও জলটল কিছুই দেখা গেল না অন্ধকারে। বাঘ বললে, "সামনেই জল! গুনে গুনে তিনটে ডুব দাও দিকি?" হাবু-গাবু-সাবু দু'পা এগুতেই আঃ, জলের মধ্যে পা! তারা বাঘকে বিশ্বাস করে চোখ বুজে নাক চেপে তিনটে ডুব দিল। আর যেই না তিন বারের বার মাথাটি তোলা দ্যাখে কি কোথায় গুহা, কোথায় বাঘ, কোথায় জঙ্গল! তারা পাঁচমিশেলী গ্রামের পদ্মভরা কাজল দীঘি থেকে মাথা তুলছে।

হাবু বললে, "বাঃ, এ যে ম্যাজিক?"

গাবু বললে, "যাক, আমাদের ভাই কপাল খুব ভালো। বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেছি।"

সাবু বললে, "চল ভাই, বাড়ি যাই। চান হয়ে গেছে, ভাত খাই।"

বাড়ি গিয়ে তিনজনে সবে খেতে বসেছে, মা ভাত বাড়ছেন, অমনি পাইক-পেয়াদা-সেপাই-বরকন্দাজ নিয়ে সেখানে 'ভপ্পর ভোঁ'—ভেঁপু বাজিয়ে এসে হাজির মন্ত্রীমশাই আর কোটালমশাই। তাঁরা হাতজোড় করে সবিনয়ে বললেন, "পেন্নাম হই হাবুসায়েব, গাবুসায়েব, সাবুসায়েব—আমরা রাজসভা থেকে আসছি। আপনাদের সঙ্গে রাজকুমারীদের বিয়ে দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে, রাজামশাই রথ পাঠিয়েছেন, দয়া করে চলুন!"

তারপর তাঁরা গ্রামসুদ্ধু সবাইকে রাজার তরফ থেকে কাপড়-গয়না-লুচি-মিষ্টি-দই-মাছ আর পান-সুপুরি উপহার দিয়ে আদর করে বিয়েতে নেমন্তন্ন জানিয়ে গেলেন। যাকে বলে সনির্বন্ধ অনুরোধ।

হাবু-গাবু-সাবু তো এখন দিব্যি বুদ্ধিমান হয়ে গেছে। মন্ত্রীর মুখে ঘটনা শুনে সবই বুঝে ফেলল। তারপর রথ তো যাচ্ছে। যাচ্ছে। যাচ্ছে—পথে যেতে যেতে ইঁদুরের গর্ত পড়ল। হাবু বলল, "একটু দাঁড়ান, এখানে আমার কাজ আছে।" বলে ইঁদুরের গর্তে একটা মণ্ডা রেখে এল।

পথে যেতে যেতে পুকুর পাড় পড়ল। গাবু বলল, "একটু দাঁড়ান, এখানে আমার কাজ আছে।" বলে ব্যাঙের বাসার সামনে একটা মেঠাই রেখে এল।

পথে যেতে জলা পড়ল। সাবু বলল, "একটু দাঁড়ান, এখানে একটু কাজ আছে।" বলে হৃষ্টপুষ্ট শুয়োর মা আর তার গোল গোল বাচ্চাদের জন্যে কিছু মণ্ডামিঠাই রেখে এল।

দেখেশুনে অবাক হয়ে কোটাল আর মন্ত্রী বলল, "এটা কী ব্যাপার?"

মুচকি হেসে হাবু-গাবু-সাবু বলল, "এটা আমাদের মানত ছিল।"

'ওই দ্যাখ দ্যাখ রথ চলেছে
গড় গড় গড় গড়াৎ
হাবু-গাবু-সাবুর আহা
বদলে গেল বরাত।।'

প্রকাশকাল : ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

টুলুরাজকুমারী আর টুবান

টুলুরাজকুমারীর যেমন গুণ তেমনি রূপ, অথচ বর পাওয়া যায় না। টুলুরাজাটি বুড়ো থুত্থুড়ে হয়ে গেছেন, রাজ্যপাট সামলাতে পারেন না তেমন। পরমরূপসী ছোটরানীই সব দেখেন। তিনি রাজকুমারীর সৎমা। রাজকুমারীর বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। বহু রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্রেরা এসেছেন টুলুরাজ্যে, কিন্তু কেউই আর ফিরতে পারেন নি। তারা যেন সবাই উবে যান।

টুলুরাজকুমারী ছাদে বসে রোদে চুল শুকোন, বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ফুলের গন্ধ শোঁকেন। রাজ্যের লোকরা তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। আর ভাবে —আহা, আমাদের এত চমৎকার রাজকন্যে, তার একটা বর জোটে না?

টুলুরাজ্যের পাশের রাজ্যে ছিলেন বুলু রাজা। বুলুরাজার তিন ছেলে। উবান,বুবান আর টুবান। উবান যেমন লম্বা-চওড়া, তার গায়ে তেমনি জোর। বুবান যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি পড়াশুনোয় ভালো। টুবান ছোট, টুবান রাণীমার আদরে শুধু খেলে বেড়ায়। সে ব্যায়ামবীরও হল না, পণ্ডিতও হল না। কিন্তু সব ব্যাপারে তারই আগ্রহ সবার চেয়ে বেশি।

উত্তরের রাজ্যে একবার দৌড়-ঝাঁপের প্রতিযোগিতা হল। বুবান তো গেলই না, উবানও গেল না। দূর! দৌড়ঝাঁপ আবার রাজপুত্রের খেলা হল, কিন্তু টুবান গেল আর ঝুড়ি ঝুড়ি সোনার মেডেল নিয়ে ফিরল।

তারপর দক্ষিণরাজ্যে হল সমুদ্রে সাঁতার দেবার প্রতিযোগিতা। বুবান তো গেলই না। উবান বলল, —দূর! সমুদ্রে তো যাবে জেলেরা, সমুদ্রে তো যাবে

মাঝিরা। ওটা একটা রাজপুত্রের কাজ হল? টুবান কিন্তু গেল। আর সব্বাইকে হারিয়ে দিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মুক্তোর ঝিনুক নিয়ে ফিরল।

টুলুরাজকুমারীর কথা উবান-বুবান-টুবান জানে। টুবান বলল, —মা, আমি টুলুরাজকুমারীকে বিয়ে করতে চাই। ওদিক দিয়েই ঘোড়ায় চড়ে আসছিলুম, ছাদে বসে চুল শুকোতে দেখেছি তাকে।

বুবান বলল,—সে কি! আমরা তোমার দুই দাদা থাকতে ছোট ভাই বিয়ে করবে—তা কি হয়? টুলুরাজকুমারীকে বিয়ে করলে করবে দাদা, উবান।

উবান খুব খুশি। তার মা তাকে বর বেশে সাজিয়ে দিলেন। তার বাবা তাকে তীক্ষ্ণ তরোয়াল দিলেন। উবান টগবগিয়ে ঘোড়ায় চড়ে টুলুরাজার দেশে চলে গেল।

দিন যায়, হপ্তা যায়, মাস যায়। উবান আর ফেরে না। তখন বুলুরাজা বললেন, —বুবান, তুমি যাও। উবানের কী হোলো একটু খোঁজ করো।

দাদার মতন সেজেগুজে বুবান গেল। কিন্তু গেল তো গেলই!

টুবান বললে, —মা, এবার আমি যাই টুলুরাজার দেশে।

মা বললেন, —না বাবা, যেও না। অমন বউ দিয়ে আমার কাজ নেই। আমার দুই ছেলে যার জন্যে জন্মের শোধ হারিয়ে গেল। কেউ তাদের আর বেরুতেই দেখেনি টুলুরাজার প্রাসাদ থেকে। তুই-ই আমার সবেধন নীলমণি। না টুবান, তুই যাসনি।

বাবা বললেন, —টুবান, তোমার মা ঠিকই বলেছেন। টুলুরাজ্যের ব্যাপার-স্যাপার আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। তুমি যেও না। আমি বরং মন্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞেস করে চর পাঠাই। চর আগে খবর নিয়ে আসুক।

টুবান চঞ্চল ছেলে। সে বাবা-মার উপদেশ না মেনে লুকিয়ে ঘোড়া নিয়ে, তরোয়াল নিয়ে পালিয়ে গেল।

পথে যেতে যেতে বনের মধ্যে সে শোনে একটা গর্ত থেকে কেউ যেন কাঁদছে। টুবান গর্তের কাছে গিয়ে দ্যাখে এক দৈত্য তার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। এতই গভীর গর্ত যে দৈত্য হয়েও সে উঠতে পারছে না। হাতি ধরবার ফাঁদ পেতেছে গ্রামের লোক, তাতে দৈত্য বেচারি ধরা পড়েছে। গ্রামের লোক তাকে এখনও দেখতে পায়নি তাই। দেখতে পেলেই তো গরম জল ঢেলে মেরে ফেলবে। তাই সে কাঁদছে।

টুবানের খুব দয়া। সে বললে, —দাঁড়াও দৈত্য, তুমি কেঁদো না। আমি আমার পাগড়িটা খুলে ঝুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি সেটা ধরে উঠে এসো।

তারপর পাগড়িটা খানিকটা ঝুলিয়ে দিয়ে টুবান ফের বললে, —কিন্তু তুমি যদি উঠে এসেই আমাকে মেরে ফ্যালো?

দৈত্য বললে, —উপকারী বন্ধুদের দত্যিদানবে কখনো ক্ষতি করে না। জীবজন্তুও না। ওই বদস্বভাব কেবল মানুষের। তুমি ভয় পেয়ো না। আমি তোমার চিরজীবনের বন্ধু হয়ে থাকব।

তখন টুবান নির্ভয়ে দৈত্যকে ওপরে তুলে আনল। উঠে এসে দৈত্য বললে, —টুবান, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

টুলুরাজকুমারীকে বিয়ে করতে, আর আমার দাদাদের উদ্ধার করতে।

দৈত্য বললে, —ও বাবা! টুলুরাজকুমারীর সৎমা তো একজন দানবী। সে অনেক কায়দা জানে—তার জন্যেই তো রাজকুমারীর বিয়ে হয় না আর রাজপুত্রেরা সবাই গায়েব হয়ে যায়।

—গায়েব হয়ে যায়? তার মানে?

—তার মানে, তাদের আর কেউ খুঁজে পায় না।

—আমার দাদারাও গায়েব হয়ে গেছে?

—তুমিও যাবে, যদি ওই প্রাসাদে ঢোকো।

—কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে।

—তাহলে চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

—তোমাকে কী করে নিয়ে যাব?

—কেন, তোমার পকেটে করে। আমি ছোট্ট এতটুকুনি হয়ে যেতে পারি।

—তুমি কি ইচ্ছারূপী? পাখি, পিঁপড়ে সব হতে পারো?

—তাই যদি পারতুম তাহলে তো পাখি হয়ে উড়ে বেরিয়ে আসতুম গর্ত থেকে, তাহলে তো পিঁপড়ে হয়ে হেঁটেই পালিয়ে আসতুম গর্তের দেওয়াল বেয়ে। না, আমি রূপ বদল করতে পারি না। বড় দৈত্য থেকে, শুধু কুচো দৈত্য হতে পারি। কড়ে আঙুলের সমান।

—তবে তাই হও। তোমাকে দেখে কেমন ভয় ভয় করে। দৈত্য অমনি কড়ে-আংলা হয়ে টুবানের পকেটে ঢুকে বসল।

কড়ে-আংলা বলল,—প্রথমে জেনে নিতে হবে ঘটনাটা কী। চলো যাই প্যাঁচার বাড়ি।

বনেই থাকত হুতোম প্যাঁচা। তখন দিনের বেলা। সে ঘুমোচ্ছিল। কড়ে-আংলা খোঁচা মেরে তার ঘুম ভাঙিয়েই একটা গিরগিটি খেতে দিল। প্যাঁচামশাই গিরগিটিটা খেয়ে ভাল করে চোখ খুললেন।

—কী ব্যাপার? কী চাই?

টুলুরাজকুমারীর ব্যাপার কী, সেটা জানতে চাই। —বলতে বলতেই একটা ইঁদুর এগিয়ে দেয় কড়ে-আংলা।

ইঁদুর পেয়ে প্রীত হয়ে প্যাঁচামশাই বললেন,—সে অতি জটিল বিষয়। ওখানে যে যায়, সে যায়।

—তা তো জানি। কিন্তু কেন যায়?

—সৎমার ম্যাজিকে।

—কী ভাবে কাটানো যাবে সেই ম্যাজিক?

—সে অতি জটিল প্রণালী। যে পারে, সে পারে।

—আমি পারি। আমি সব জটিল বিষয়কে সরল করে ফেলতে পারি। —টুবান বলে।

বাঃ রে ছেলে এই তো চাই। —খুশি হয়ে হুতোম প্যাঁচা গড়গড় করে টুলুরাজ্যের পুরো কাহিনীটা ওদের শুনিয়ে দেয়।

—সৎমার ইচ্ছে তার ভাইপোর সঙ্গে টুলুরাজকুমারীর বিয়ে দেবে। কিন্তু সে ভাইপো দানব, তার স্বভাবচরিত্তির ভাল না, বড়ই হিংস্র। তাই টুলুরাজার মত নেই এই বিয়েতে। এখন সৎমা কায়দা করে সব রাজপুত্তুরদের পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দিচ্ছেন, তারপরে তাদের ফুলগাছ করে বাগানে রেখে দিচ্ছেন। এই হচ্ছে কথা।

—তার মানে উবান-বুবানও ফুলগাছ? তাতে উবানফুল আর বুবানফুল ফুটছে? কেমন দেখতে উবানফুল, বুবানফুল?

প্যাঁচা বললে, —দূর! উবানফুল বুবানফুল কেন হবে? ওরা তো দুজনেই হয়েছে গাঁদা ফুলের গাছ। উবান হয়েছে মোটাসোটা হলুদ গাঁদা, আর বুবান হয়েছে সুশ্রী রক্তচন্দন গাঁদা।

শুনে টুবানের মনে খুব দুঃখু। হবি তো হ, গোলাপ, পদ্ম, রজনীগন্ধা কিংবা কদমফুল, বেলফুল, কেয়াফুল—এসব না হয়ে কিনা গাঁদাফুল?

প্যাঁচা বললে,—শোনো, সমুদ্রতীরে আছে বুড়ো কাছিম। সেই বলে দিতে পারবে সৎমা-দত্যির ম্যাজিক কী করে কাটাতে হয়? কাছিমের তো অনেক বয়েস, তার আরও অনেক বেশি জ্ঞান। তোমরা তার কাছে যাও।

টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে টুবানরা পৌঁছল সমুদ্রতীরে। তারপর ডাক দিল, —কাছিম দাদু! ও কাছিম দাদু!

কাছিমবুড়ো কাছেই রোদ পোয়াচ্ছিল একটা পাথরের পাশে বালির বেলায়।

খুশি হয়ে বলল, —আমাকে কোন নাতিটা ডাকে রে?

—আমি টুবান।

—টুবান তোর কী চাই?

—আমার দুই দাদা চাই, আমার টুলুরাজকুমারী বউ চাই।

—তাহলে শোন্। উবান যখন প্রাসাদতোরণে গেল, দাসী তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে সবুজ এক গ্লাস শরবৎ দিয়েছিল। সেই সবুজ শরবৎ খেয়ে ওর গায়ের সব শক্তি চলে গেল। ভিতরের ঘরে ওকে নিয়ে যে-চৌকিতে বসালো, তার চারদিকে আছে চারটে কাঠের বাঁদর। শরবৎ খেয়ে তো উবান ঝিমিয়ে পড়েছে। ঘুম ঘুম। ঝিম ঝিম। তখন কী হল? চারটে কলের বাঁদর এসে উবানের মাথায় এইসা গাট্টা মারল উবান অজ্ঞান হয়ে গেল। ব্যস! সৎমা তাকে মন্ত্র পড়ে গাঁদাফুলের গাছ বানিয়ে দিয়েছে।

—আর বুবান? বুবানের কী হল?

—বুবানেরও ওই একই কাণ্ড।

—তাহলে আমার কী হবে?

—তোমারও তাই হবে, সব রাজপুত্তুরদের যা হয়েছে, যদি সবুজ শরবৎ খাও।

—যদি সবুজ শরবৎ না খাই?

—তাহলেও বাঁদররা তোমাকে পেটাবে। তুমি একা চারজনের সঙ্গে পেরে উঠবে না। বরং এককাঁদি কলা নিয়ে যেও। বাঁদররা সেটা নিয়ে চলে যাবে।

—বাঃ, তবে তো ভাল। হয়েই গেল।

—না হয়ে গেল না। তারপর আছে সাতটা দরজা। দাসী তিনটে পার করে দেবে। বাকি চারটে তোমাকেই খুলতে হবে দাদাভাই।

—বেশ তো, খুলব।

—সেই তো বিপদ। খুললেই বিপদ। না খুললেও উপায় নেই।

—কিসের বিপদ কাছিম দাদু?

—প্রথমটা খুললেই একটা চিতাবাঘ লাফিয়ে আসবে। তোমাকে খেয়ে ফেলতে। অবশ্য যদি একটা বড় টুকরো মাংস নিয়ে যাও, সেইটে ওকে ছুঁড়ে দিলে মাংসটা নিয়েই সে চলে যাবে।

—বাঃ, এই তো হয়ে গেল।

—উহুঁ! বুড়ো কাছিম তার লম্বা গলাটা দোলায়; তারপরের দরজাটা যেই খুলবে, অমনি একটা বীভৎস ডালকুত্তা লাফিয়ে পড়বে। তাকে দেবার জন্যে

খুশি হয়ে বলল, —আমাকে কোন নাতিটা ডাকে রে?

—আমি টুবান।

—টুবান তোর কী চাই?

—আমার দুই দাদা চাই, আমার টুলুরাজকুমারী বউ চাই।

—তাহলে শোন্। উবান যখন প্রাসাদতোরণে গেল, দাসী তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে সবুজ এক গ্লাস শরবৎ দিয়েছিল। সেই সবুজ শরবৎ খেয়ে ওর গায়ের সব শক্তি চলে গেল। ভিতরের ঘরে ওকে নিয়ে যে-চৌকিতে বসালো, তার চারদিকে আছে চারটে কাঠের বাঁদর। শরবৎ খেয়ে তো উবান ঝিমিয়ে পড়েছে। ঘুম ঘুম। ঝিম ঝিম। তখন কী হল? চারটে কলের বাঁদর এসে উবানের মাথায় এইসা গাট্টা মারল উবান অজ্ঞান হয়ে গেল। ব্যস! সৎমা তাকে মন্ত্র পড়ে গাঁদাফুলের গাছ বানিয়ে দিয়েছে।

—আর বুবান? বুবানের কী হল?

—বুবানেরও ওই একই কাণ্ড।

—তাহলে আমার কী হবে?

—তোমারও তাই হবে, সব রাজপুত্তুরদের যা হয়েছে, যদি সবুজ শরবৎ খাও।

—যদি সবুজ শরবৎ না খাই?

—তাহলেও বাঁদররা তোমাকে পেটাবে। তুমি একা চারজনের সঙ্গে পেরে উঠবে না। বরং এককাঁদি কলা নিয়ে যেও। বাঁদররা সেটা নিয়ে চলে যাবে।

—বাঃ, তবে তো ভাল। হয়েই গেল।

—না হয়ে গেল না। তারপর আছে সাতটা দরজা। দাসী তিনটে পার করে দেবে। বাকি চারটে তোমাকেই খুলতে হবে দাদাভাই।

—বেশ তো, খুলব।

—সেই তো বিপদ। খুললেই বিপদ। না খুললেও উপায় নেই।

—কিসের বিপদ কাছিম দাদু?

—প্রথমটা খুললেই একটা চিতাবাঘ লাফিয়ে আসবে। তোমাকে খেয়ে ফেলতে। অবশ্য যদি একটা বড় টুকরো মাংস নিয়ে যাও, সেইটে ওকে ছুঁড়ে দিলে মাংসটা নিয়েই সে চলে যাবে।

—বাঃ, এই তো হয়ে গেল।

—উহুঁ! বুড়ো কাছিম তার লম্বা গলাটা দোলায়; তারপরের দরজাটা যেই খুলবে, অমনি একটা বীভৎস ডালকুত্তা লাফিয়ে পড়বে। তাকে দেবার জন্যে

একটা শক্ত মোটাসোটা হাড় নিয়ে যেতে হবে।

—তার পরেরটায়?

—ছ'নম্বর দরজা পাহারা দেয় একটা সাপ। সে ফোঁস করে ফণা তুলে তেড়ে আসবে। তার গায়ে মন্ত্রপড়া কর্পূর ছুঁড়ে দিতে হবে।

—মন্ত্রপড়া কর্পূর?—টুবান বলে ঃ ও বাবা! সে আবার কোন্‌খানে পাব?

—বেদেরা দিতে পারবে। ওই জঙ্গলের কিনারে বেদেদের তাবু পড়েছে। তাদের কাছে গেলেই পাবে।

—আর সাত নম্বর?

—সাত নম্বর দরজা খুললে দেখবে সুগন্ধে ভরা একটা অপূর্ব শোবার ঘর। তুমি যেই ঢুকবে এক পরমাসুন্দরী রাজকুমারী এসে তোমাকে পান সুপুরি দিয়ে, গদিতে বসাবে। নিজেও পাশে বসবে। বলবে, সেই টুলুরাজকন্যে। তুমি তখন যেন তাকেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বোসো না।

—কেন দাদু, কেন দেব না?

—সে যে দাসী! তুমি তাকে পরীক্ষা করবে। বলবে,—পান কেয়ে পিক ফেলব কোথায়? পিকদানি কই? তক্ষুনি সেই মেয়ে দৌড়ে গিয়ে পিকদানি এনে দেবে। তুমি তখন বলবে, না বাপু তুমি তো রাজকুমারী নও। তুমি দাসী। সে তখন ছুট্টে পালিয়ে যাবে।

—তারপর আমি কী করব, দাদু?

—তুমি উঠে পায়চারি করতে করতে বলবে,—রাজকন্যের বাড়িতে এলাম, রাজকন্যেরই দেখা নেই। —এ কী রে বাবা? তখন আরও সুন্দরী একটি রাজকন্যেবেশী মেয়ে আসবে ঘরে। এসে গদিতে তোমার পাশে বসবে। তুমি কিন্তু তাকেও বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বোসো না।

—তবে?

—সেও যে দাসী! তুমি তাকে বলবে, —রাজকন্যের শোবার ঘরে এত ধুলো? ঝাঁটপাট পড়ে না নাকি? বললেই সে উঠে গিয়ে দৌড়ে একটা ঝাঁটা নিয়ে এসে ঝাঁট দিতে শুরু করবে। তুমি তখন বলবে, —যাও তো দেখি, তোমার মনিবানীকে ডেকে আনো তো, আমি তাকেই বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছি। —বললেই সে ছুটে পালাবে। ঘরে এবার আসবে আর এক পরমাসুন্দরী। এটি কিন্তু সৎমা নিজে। দেখে বুঝতেই পারবে না—সে রানী, না রাজকুমারী। সে মালা হাতে যেই এগিয়ে আসবে—তুমি ঝট্ করে নিচু হয়ে তাকে প্রণাম করে ফেলে বলবে,—প্রণাম হই ছোট রানীমা, আমি আপনার জামাই। সাত দুয়োর পার হয়েছি, এবার ওই মালাটি

আমারই। আর এই মালাটি আপনার। বলেই তার পায়ে এই মণিরত্নের শেকলটা পরিয়ে দেবে।

বলে বুড়ো কাছিম তার খোলের নীচে থেকে অপূর্ব একটা শেকল বের করল। সেই শেকলটা সমুদ্রের মণিরত্ন দিয়ে তৈরি। তা থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। বুড়ো কাছিম বলল,—এই শেকলে যে বাঁধা পড়ে সে চিরকালের জন্য দাসী হয়ে যায়। তুমি বলবে, রানীমা এবার রাজকন্যেকে ডেকে আনুন। আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করুন। রাজ্যসুদ্ধু নেমন্তন্ন করুন। পাশের রাজ্যের লোকদেরও নেমন্তন্ন করুন। আর বাগানের গাছগুলোকে সব মুক্ত করে দিন। নইলে এ মণির শেকল কেউটে সাপ হয়ে কিন্তু আপনাকে ছোবল মারবে!

শেকল পরে রানী হাঁটবেন কেমন করে? —টুবান অবাক।

—সে কি যেমন তেমন শেকল? নূপুরের মতন জড়িয়ে থাকবে দু'পায়ে। অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা থাকবেন রানীমা।

—তারপরে? তারপরে কী হবে দাদু?

—তারপরে রানীমা টুলুরাজকন্যেকে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে মালাবদল করিয়ে দেবেন। তোমার ভাইদের মুক্তি দেবেন। রাজ্যে রাজ্যে ঢ্যাড়া পিটিয়ে নেমন্তন্ন করবেন। তুমি যা চাও তাই পাবে।

—কাছিম দাদু, কাছিম দাদু, তোমার এত দয়া? তুমি আমাকে সব বলে দিলে! আমি তোমাকে কী দেব, দাদু?

—আমাকে আবার কী দিবি? আমাকে যা দেবার সে তো আগেই দিয়েছিস। টুবান! তুই তো আমাকে দাদু ডেকেছিস, আমার নাতি হয়েছিস। বৌ নিয়ে ফেরার সময়ে নাতবৌয়ের মুখখানা একবার দেখিয়ে নিয়ে যাস দাদাভাই। তাহলেই হবে!

ব্যস্। তারপর কড়ে-আংলা আর টুবান ছুটল। টুলুরাজ্যের কসাই মশাইকে দশটা সোনার মোহর দিয়ে বলল, —ম-স্ত বড় মাংসের টুকরো চাই চিতাবাঘের জন্যে। আর খুউব শক্ত হাড় চাই ডালকুত্তার জন্যে।

কসাই মশাই তাড়াতাড়ি সেসব জুগিয়ে দিলেন। এরপর টুবান ফলওলাকে দশটা সোনার মোহর দিয়ে বললে,—এককাঁদি কলা চাই দাদা—বাঁদরদের জন্যে।

ফলওলাদাদা কলা দিলেন।

ওদিকে দৈত্য চলে গেল দূরের জঙ্গলের কিনারে, বেদেদের তাঁবুতে। দশটা সোনার মোহরের বদলে মন্ত্রপড়া কর্পূর চাই বেদেনীদিদি। বলতেই বেদেনীদিদি

মন্ত্রপড়া কর্পূরের কৌটো মানুষরূপী দৈত্যের হাতে তুলে দিলে।

কলা, মাংস, হাড়, কর্পূর, মণিমালা আর কড়ে-আংলাকে তার পোশাকের নিচে লুকিয়ে নিয়ে টুবান চলল।

আর রাজকন্যেকে দেবার জন্যে কী নিল টুবান? তার জন্যে নিল প্রাণভরা ভালবাসা আর চোখভরা স্বপ্ন।

একসময় টুবান গিয়ে টুলুরাজপ্রাসাদে ঘণ্টা নাড়ল।

দাসী এসে টুবানকে নিয়ে গেল বৈঠকখানায়। সবুজ শরবৎ এনে দিল। টুবান শরবৎটা ফুলদানীতে ঢেলে দিল। অমনি ফুলগুলো সব ঢলে পড়ল ঘুমে।

দাসী এসে ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে গদিতে বসালো। টুবান বসে মাথার ওপরে কলার কাঁদিটা ধরে রইল। অমনি বাঁদরগুলো এসে কলার কাঁদিটা নিয়ে পালিয়ে গেল। টুবান দেখল তারা মনের আনন্দে খোসা ছাড়িয়ে কলা খাচ্ছে।

খানিক পরে দাসী এসে দ্যাখে টুবান চোখ খুলে বসে আছে। দাসী তখন বললে, —আপনাকে সপ্ততোরণ পেরিয়ে রাজকুমারীর কাছে যেতে হবে। তিনটে দরজা আমিই খুলে দেব। বাকি চারটে আপনি খুলে নেবেন।

তিনটে দরজা একে একে খুলে গেল। বেতের, বাঁশের, আর কাঠের। তখন চারটে চাবি টুবানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দাসী চলে গেল। টুবান লোহার দরজার হাতল ঘোরাতেই হালুম করে বাঘ যেমনি লাফ মেরেছে, চট করে কড়ে-আংলা মাংসের ডেলাটা ছুঁড়ে দিয়েছে বাঘের দিকে।

বাঘ মাংস মুখে নিয়ে দরজা ছেড়ে চলে গেল।

তারপরে টুবান আবার দরজার হাতল ঘোরাতেই খ্যাঁক করে ডালকুত্তা যেমনি তেড়ে এসেছে, কড়ে-আংলা ঝটপট হাড়টি ছুঁড়ে দিয়েছে।

কুকুর হাড় মুখে নিয়ে দোর ছেড়ে চলে গেল।

রুপোর দরজা টুবান খুলতেই ফোঁস করে উঠেছে রাজ-গোখরো! মন্ত্রপড়া কর্পূরটি যেই ছুঁড়ে দিয়েছে কড়ে-আংলা, অমনি সাপ কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আর শুধু সোনার দরজাটি বাকি।

হাতল ঘুরিয়ে টুবান দ্যাখে অপরূপ এক ঘর! আহা, কী নীল আর রুপোলী রঙের দেওয়াল! নীল রেশমের আর রুপোলী রঙের আসবাব। ঘরে চন্দনের সুবাস।

টুবান ঘরে ঢুকে গদিতে বসল। পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যে এসে এক মুখ হেসে, তাকে পানসুপুরি দিল সোনার বাটা থেকে। বলল, —স্বাগত আমার

রাজপুরীতে।

টুবান বলল, —পিক ফেলব, পিকদানী কই?

বলতেই সে ছুটে গিয়ে রুপোর পিকদানী নিয়ে এল।

পিক ফেলে টুবান বললে, —তুমি তো বাপু রাজকন্যে নও? রাজকন্যেকে ডাকো!

সে লজ্জায় পালিয়ে গেল।

তারপর এল দু'নম্বর রাজকন্যে।

তাকে দেখেই টুবান বলল, —ঘরে এত ধুলো কেন?

অমনি সে ঝাড়ু লাগাতে শুরু করে দিল।

টুবান হেসে বললে, —হয়েছে! এবারে যাও রাজকন্যেকে ডাকো।

মেয়েটা লজ্জায় অমনি দৌড়ে পালাল।

গোলাপফুলের মালা হাতে এবার এলেন চোখ ঝলসানো এক রূপসী, তাঁর সর্বাঙ্গে গোলাপফুলের গন্ধ। তাকালে আর চোখ ফেরে না। আহা, গায়ের রঙটিও গোলাপফুলের, মুখের লাবণ্যও গোলাপফুলের! কিন্তু টুবান তাঁকে রাজকন্যে বলে ভুল করলে না। সে টিপ্ করে সুন্দরীকে এক পেন্নাম ঠুকে দিয়ে বললে, —ছোট রানীমা, আমি আপনার জামাই টুবান। সাত দুয়োর পার হয়েছি, ঐ মালাটি আমারই। আর এই মালাটি আপনার।

বলেই তাঁর পায়ে মণিমালার শেকলটি পরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে শেকল একজোড়া মণির নূপুর হয়ে গেল। রানীমাও টুবানের বশ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে মন্দ ভাবই রইল না।

রানীমা খুশি মনেই ওদের বিয়ের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। বাগানের সব গাছকেই আবার মানুষ করে দিলেন। রাজ্যে রাজ্যে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে লোক নেমন্তন্ন করতে লাগলেন। উৎসব জমে গেল দুই রাজ্যে হৈ হৈ। বিয়ে বাড়ি।

ঐ যে, উবান বুবান আর টুবান রাজকন্যেকে নিয়ে বুড়ো কাছিমের কাছে যাচ্ছে—ওকেই আগে বউ দেখানোর কথা কি না?

আর বর-বউয়ের সঙ্গে আহ্লাদ করে বাজনা বাজাতে বাজাতে রথ, ঘোড়া, হাতি নিয়ে শোভাযাত্রা করে যারা আসছে ওরা কারা?

ওরা সেইসব অভিশপ্ত রাজপুত্তুর—যাদের টুবান মুক্তি দিয়েছে। ওরা সবাই এখন টুবানের চিরবন্ধু।

আর সেই যে দৈত্য কড়ে-আংলা! তার আহ্লাদ দ্যাখে কে? সে এখন আবার দৈত্যরূপী। সেই তো আগে আগে মস্ত মোটা ভেঁপুদুটো বাজাতে বাজাতে মার্চ

করতে করতে আসছে। সে এখন উবান বুবান টুবানের চার নম্বর ভাই, দুতান।

দুতানের গল্পটা পরের বার।

প্রকাশকাল : ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
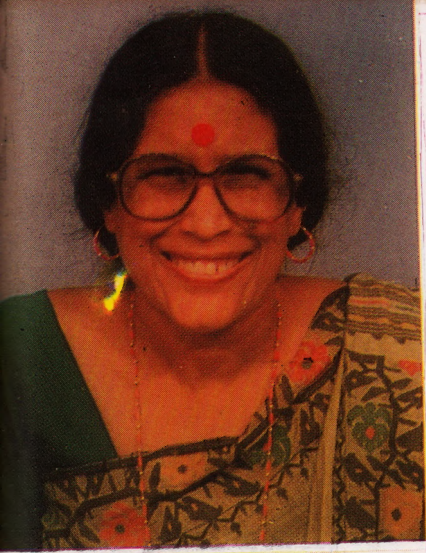
নবনীতা দেব সেনের জন্ম ১৯৩৮, 'ভালো-বাসা' বাড়িতে, দক্ষিণ কলকাতায়। জন্মলগ্নে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন নবনীতা। বারো বছর বয়সে ইওরোপ ভ্রমণ, পিতা নরেন্দ্র দেব ও মা রাধারাণী দেবীর সঙ্গে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি.এ। যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যে এম.এ। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। পরের বছরই অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সঙ্গে বিবাহ। হারভারডে ডিস্টিংশন নিয়ে এম.এ। ইন্‌ডিয়ানায় পি-এইচ,ডি। বর্তমানে যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপিকা।

নেশা : বই, রেকর্ড ও যথেচ্ছ ভ্রমণ।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'প্রথম প্রত্যয়' (১৯৫৯) প্রথম উপন্যাস 'আমি অনুপম' ১৯৭৬-এ শারদীয়া আনন্দবাজারে। এ-ছাড়াও বহু গ্রন্থ— গল্পের, প্রবন্ধের, ভ্রমণ কাহিনীর, কিশোর সাহিত্যের।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ □ দেবাশীষ দেব